আশ্বিন ১৩৮৫

আনন্দমেলা

শুরু হল
আশাপূর্ণা দেবীর
জমজমাট উপন্যাস
ভুতুড়ে কুকুর

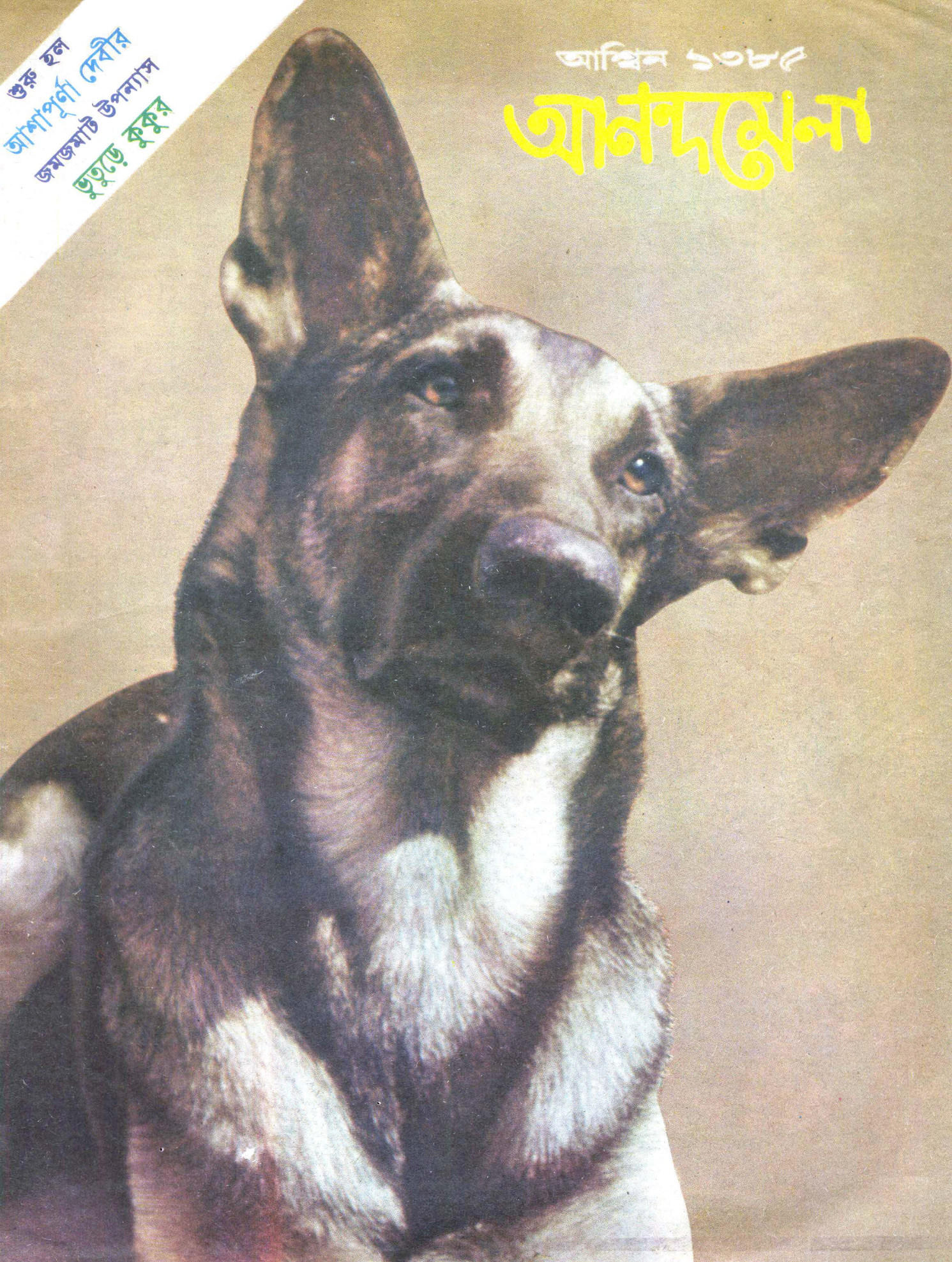

Hard Copy - Debasish Roy
Scan - Debasish Roy
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and
preserved by Dhulokhela Team
for reading purpose only

Anyone can contribute in Dhulokhela by giving their
old rare magazines to us for preservation.
Please email us at
optifmcybertron@gmail.com

লিলিপুট লিলিপুট
করছ তুমি কি?
এই দেখনা, আমি তোমার
পায়ে চড়েছি।

দেখতে দারুন নরম ধরণ
উঠতি পায়ের মাপটি যেমন

লিলিপুট 88
টা. ১৭.৯৫

Bata

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

আশ্বিন ১৩৮৫, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প

ভূতেরা বড় মিথ্যুক। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪
সোমেন গুপ্ত নিখোঁজ। রমানাথ রায় ৪৯

উপন্যাস

ভুতুড়ে কুকুর। আশাপূর্ণা দেবী ৯
অলৌকিক। বিমল কর ৩৭

আত্মকথা

খেলতে খেলতে। চুনী গোস্বামী ১৫

ভ্রমণ-কাহিনী

অ্যাথেন্স। পবিত্র সরকার ২৩

ছড়া

মিউজিয়ামে। সরল দে ১৩ ● কাবুল। জয়ন্ত দাস ২০
বান। অনিল কর্মকার ৫০ ● নান্তা-নাবুদ। রঞ্জন ভাদুড়ী ৫১

কমিক্‌স

বিশ্বকাপ-ফুটবল ২১ ● টারজান ২৬ ● টিনটিন ৩০
গোয়েন্দা বাজ ৩৬ ● নোলেদা ৫৩

লেখাপড়া

মজার পড়া। কুম্ভক ১৯ ● মাধ্যমিকে ফার্স্ট গৌতমের সঙ্গে ২০
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ২৫
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন্‌-এর ফার্স্ট বয় ৩৩

খেলাধুলো

আবার সেই শ্যাম। অশোক দাশগুপ্ত ৪১
শীল্ডের পঁচাশি পূর্ণ হল। মুকুল দত্ত ৪৩
ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপর্যয়। পুষ্পেন সরকার ৪৫
বর্গ ও নাম্রাতিলোভা। চিরঞ্জীব ৪৬
খেলার মজা। দিলীপ দত্ত ৪৭
জ্যাক জনসন। সুব্রত সরকার ৪৮

ধাঁধা-মজা-রহস্য

শব্দ-সন্ধান ২৮ ● ধাঁধা ২৮ ● কিসের ফোটো ২৯
উত্তর বটে ২৯ ● মজার খেলা ২৯ ● শুধু একবার ২৯ ● আটখানা ২৯

অন্যান্য লেখা

তোমাদের পাতা ২২ ● দুঃসাহসিক অভিযান ৫২ ● মণিমেলার খবর ৫২
আঁকো ৫৪ ● শেখো ৫৪

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি·আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

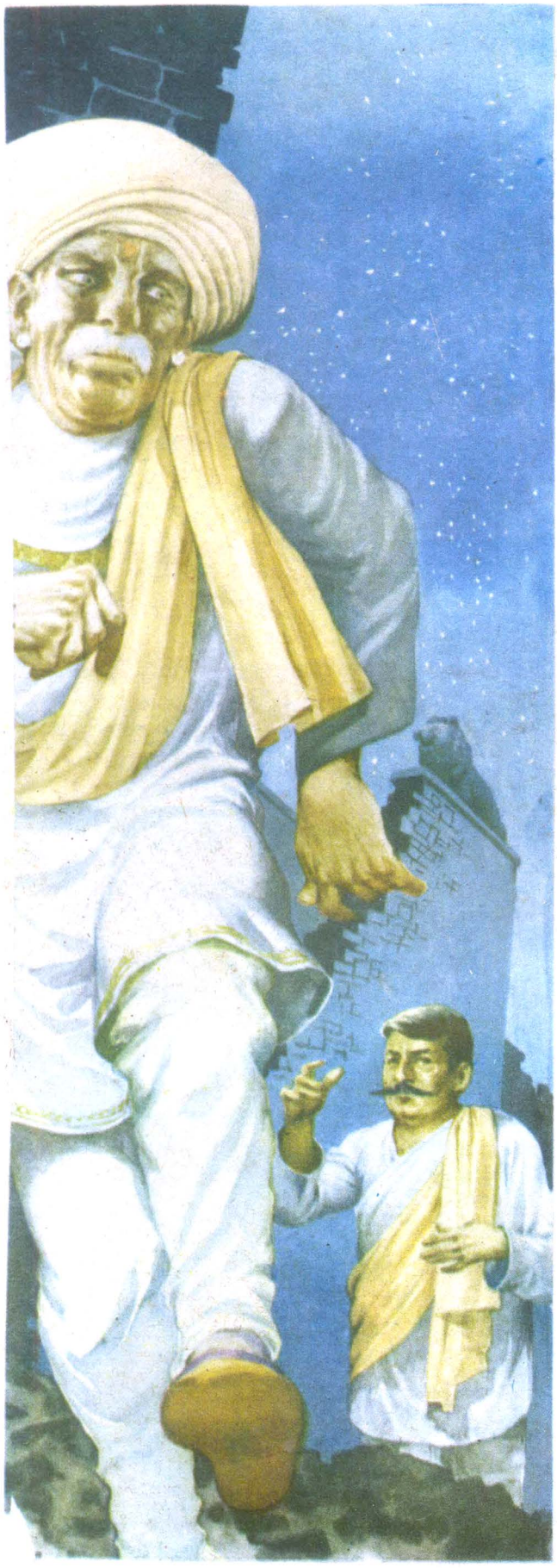

ভূতেরা বড় মিথ্যুক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভূতেরা বড় মিথ্যুক।

না, কথাটা আমার নয়। এ শহরের সবচেয়ে লম্বা পাড়ির বাসে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাবার মুখে বেশ খালি হয়ে আসা বাস-এর একটি বেঞ্চিতে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ একটি পুঁটলিতে যাঁর ছেঁড়া-খোঁড়া একটা খেরো-খাতা পেয়ে মালিকের নাম-ঠিকানা তাতে খুঁজে পেলে ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে সেটা নিয়ে এসেছিলাম, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম ভূত-শিকারী দুর্জ্ঞেয়পরিচয় সেই মেজকর্তাও একথা বলেননি। এ মন্তব্যটি হল মুনশি মুলুকচাঁদের, মেজকর্তার খেরো-খাতা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে যাঁর খোঁজ পেয়েছি।

মুনশি মুলুকচাঁদ মেজকর্তাকে বেশ একটু টিটকিরি দিয়েই বলেছিলেন, "যাদের পেছনে ছুটে-ছুটে মাথার অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন, এতদিনেও তাদের একটু চিনলেন না! বড়া আফসোস কি বাত কর্তামশাই, আপনার জন্যে বড়া দুখ হয়, আপনি এখনও জানেন না যে, একদম ষোল আনা সাচ্চা আদমিরও ওপারে গেলে জবান ঝুটা হয়ে যায়। সব ভুল-ভাল যা মন চায় কিসসা শুনিয়ে দেয় আপনাদের। আর দেবে নাই বা কেন? তাদের যে-রকম জ্বালাতন আপনারা করেন, তাতে আপনাদের নিয়ে একটু বেয়াড়া রসিকতা করে শোধ নিতে চাওয়া তাদের খুব অন্যায় কি?

"এই ধরুন, আপনাদের কী এক নয়া যন্তর এসেছে, কি ওই পেলেনচিট না প্যালানচি কী যেন নাম। কাঠের একটা পানপাতার তলায় তিনটে চাকা বসানো। যেখানে-সেখানে যখন-তখন একটু সুবিধে আর সময় পেলেই ক'জনে মিলে টেবিলের ওপর ওই প্যালান্‌চি নিয়ে আপনারা বসে যান। আপনারা ক'জনে ওই কাঠের পানপাতার ওপর হাত রেখে চোখ বুজে বসে যারা ওপারে গিয়েছে তাদের কথা ভাবেন আর তাতেই মনে করেন ওপারের ওরা চুম্বকের টানে লোহার মত ওই প্যালানচিতে এসে ভর না করে পারবে না। তা ওরা তাই আসে আর প্যালান্‌চিতে ভর করে তা যে চালায় তাও ঠিক। কিন্তু কেন আসে জানেন? আসে কখনো-কখনো আপনাদের বুদ্ধিশুদ্ধির দৌড় দেখে আপনাদের নিয়ে একটু মজা করতে। যেমন দু-চারটে অজানা খবর আপনাদের মনের লুকোনো পাতা থেকেই পড়ে নিয়ে আচমকা জানিয়ে দিয়ে তাক লাগানো। তাক লাগাবার পর ওই পানপাতা প্যালানচি নাড়িয়ে যা লেখে তাতেই আপনারা ভয় ভক্তি বিশ্বাসে গদগদ।

"সে যারা যা হয় হোক, আপনার মতো পাকা জহুরি কিনা ওদের কথা শুনে এমন ভুলটা করলেন?"

"যার তার তো নয়," বলেছিলেন মেজকর্তা, "কথা শুনেছি তো খোদ লালা রাজারামের!"

"লালা রাজারামের!" হেসেছিলেন মুনশি মুলুকচাঁদ।

হেসে তিনি কী বলেছিলেন, আর তার জবাবে কী বলেছিলেন মেজকর্তা, কথাটা উঠেছিল কী থেকে, আর কোথায় কেনই বা এমন সব কথা হয়েছিল তা স্বয়ং মেজকর্তার কাছ থেকে তাঁর নিজের জবানিতে শোনাই নিশ্চয় ভাল।

"আশা তো দূরের কথা," তাঁর খেরো খাতায় লিখেছেন মেজকর্তা, "যা ভাবতে পর্যন্ত পারিনি তাই এবার সত্যি ঘটেছে

একেবারে অবাক করে দিয়ে।

"কিন্তু অবাক বা হই কেন? একটু ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারি, যা সোজা আর হিসেবমাফিক তার চেয়ে উল্টোটা দুনিয়ায় বড় কম ঘটে না।

"এই যেমন মাছ ধরার বেলায় হামেশা দেখি। বেশ করে আগে থাকতে চার ফেলে নিখুঁত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একেবারে সেরা ছিপ-টিপ নিয়ে আর সবচেয়ে সরেস টোপ ফেলে যেখানে বসি, সেখানে এবেলা ওবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার ধ্যানই কতবার না সার হয়। আর তাইতেই বদমেজাজ নিয়ে ফিরে যেতে-যেতে বেয়াড়া কোনো আঘাটায় নেহাত হেলায়-ফেলায় টোপ-গাঁথা বঁড়শিটা একবার ছুঁড়ে দিয়েছি কি, চোখের পাতা না পড়তে পড়তে চোঁ-চাঁ কিসের টানে জলের তলায় ফাতনা উধাও হওয়ার সঙ্গে সুতো ছাড়ার বেগে হুইলের গোঙানি যেন আর থামতে চায় না।

"ভাগ্য আর-একটু ভাল হলে সেই দফাতেই শেষ পর্যন্ত হয়ত আধমনি একটি মাছের রাজাকে কাটা কলাগাছের ভেলায় চড়ে জল থেকে শেষ পর্যন্ত তুলে আনতে হতে পারে।

"এ যাত্রায় আমার যা হয়েছে তা ঠিক ওই। আমার সেই চিরকেলে নেশার তাগিদে নয়, স্রেফ একটু বিদেশ ঘোরাফেরা আর সেই সঙ্গে যেটুকু তীর্থধর্ম হয় তা সারবার জন্যে কিছু-দিনের মতো বেরিয়ে পড়েছিলাম।

"সময়টা মোটে ভাল নয় বলে অনেকে একটু বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো ডাঙার পথ মাড়াচ্ছি না বললেই হয়। আমার নিজের ফরমাশ দিয়ে বানানো বজরা, মাঝিমাল্লাও সব আমার পুরনো পাকা লোক। যেখানে যাবার, জলে-জলেই যাব তাদের নিয়ে। ছোটখাটা তো নয়, প্রায় অকূল নদী। এপারে কিছু লোক দেখলে ওপারে গিয়ে ভিড়লেই হল। সুতরাং আমার ভাবনাটা কিসের?

"তা সেরকম ভয়-ভাবনার কিছু হয়নি এ-পর্যন্ত। হেসে-খেলে ভেসে-ভেসে অমন দু-দুটো মুল্লুক তো পার হয়ে এলাম, তার মধ্যে কখনো-সখনো রাতবিরেতে গুড়ুম-গাড়ামের মতো যা আওয়াজ শুনেছি তা মেঘের ডাক যে নয়, তা কে বলতে পারে!

"ওসব কিছুর বদলে যা হ'ল তা এই—

"কৃষ্ণপক্ষের নবমী - দশমী। রাত তখন প্রথম প্রহর পার হয়েছে। মেঘে ঢাকা আকাশ যেমন অন্ধকার তেমনি অন্ধকার নদীর জল। স্রোত আর হাওয়ার সুবিধে নিতে যে-পার ঘেঁষে বজরা যাচ্ছে, সেখানকার সব কিছুও যেন গাঢ় কালির পোঁচ লাগানো।

"এরই মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে বড় মাঝিকে ব্যস্ত হয়ে ডাকলাম, 'দেওলাল! দেওলাল! দেখতে পেয়েছ? শুনতে পাচ্ছ কিছু?'

"দেওলাল তখন আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। একটু যেন দ্বিধা করে বললে, 'হাঁ সরকার।'

"'তাহলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' একটু ধমকের সুরে বললাম, 'বজরা রোখো, লাগাও ওই ঘাটে।'

" 'কিন্তু সরকার,' দেওলাল আমার ধমক খেয়েও সামান্য একটু আপত্তি করে, 'দিনকাল বড় খারাপ! একেবারে অজানা ঘাটে এমন করে বজরা ভিড়নো কি—'

"তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আবার ধমকে উঠলাম, 'দিনকাল খারাপ তো কী? অজানা ঘাটে ওই একটা মানুষ আমাদের বজরা-সমেত এতগুলো মানুষকে খেয়ে ফেলবে? মানুষটা আমার নাম ধরে ডাকছে শুনতে পেয়েছ?'

"এমন অসম্ভব জায়গায় ওই নাম ধরে ডাকাটা যত তাজ্জবই করুক তা শোনার পর বজরা না থামিয়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"যেখানে মানুষটাকে দেখেছি, বজরা এতক্ষণে স্রোতের টানে তা ছাড়িয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। সেখান থেকে বজরা ঘুরিয়ে যথাস্থানে লাগাবার হুকুম দিয়ে দেওলাল আমার কাছে ফিরে আসবার পর বললাম 'যাও, আমার কামরা থেকে বন্দুকটা বরং নিয়ে এসো।'

"দেওলাল বন্দুক আনতে গেল না। আনলে বজরা ঘাটে লাগবার পর রীতিমতো লজ্জাতেই পড়তাম। কারণ এমন একটা অসম্ভব জায়গা থেকে এমন অবিশ্বাস্যভাবে যে আমায় ডেকেছে, সে আর কেউ নয়, লালা রাজারাম। তার সঙ্গে এই পথে দেখা হওয়ার ব্যবস্থা খত লিখে আগে থাকতেই আমাদের ঠিক হয়ে আছে।

"তা থাকলেও লালা রাজারামের এমন জায়গায় এ-সময়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার বজরা থামাবার জন্যে ডাক দেওয়াটা অবশ্য একেবারে অদ্ভুত কল্পনাতীত ব্যাপার। সেটা কেমন করে সম্ভব হল?

"বজরা পাড়ে লাগবার পর তা থেকে বেশ কষ্ট করেই সেই আঘাটায় নেমে সেই কথাই রাজারামকে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, 'এই এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কেন লালাজি? তোমার তো আমার সঙ্গে কাল সকালে দিলদারনগর ছাড়িয়ে সেই জামানিয়ার ঘাটে দেখা করার কথা!'

" 'সেখানে কাল সকালে থাকতে পারব না বলেই তোমায় যাবার পথে ধরবার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' জানাল লালাজি।

"তার এ জবাবে বিস্ময়টা বাড়ল বই কমল না। বেশ একটু হতভম্ব হয়েই তাই বললাম, 'কী বলছ লালাজি? অন্ধকারে ঠিক-ঠাহর করতে পারছি না। কিন্তু জায়গাটা চৌসা বলেই মনে হচ্ছে। এখান থেকে নদী দিয়ে জামানিয়া যেতে পঞ্চাশ মাইলের কম নয়। এই এতখানি রাস্তার মধ্যে ঠিক কোথায় দাঁড়ালে আমার বজরা ডেকে থামাতে পারতে তা তুমি ঠিক করলে কী করে?'

" 'বুদ্ধু নয় বলেই ঠিক করতে পারলাম।' জবাব দিয়ে লালাজি বেশ সোজাভাবেই রহস্যটা পরিষ্কার করে দিল। লালাজি এই অঞ্চলের পয়লা নম্বর কারবারি। এখানকার নদীর হাড়হদ্দ তার জানা। তাই এ-পথে পুব থেকে পশ্চিমে যেতে ছোট বড় সব নৌকোকে স্রোতের প্যাঁচে এই জায়গাটিতে নদীর দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে যেতে হবে জেনেই লালাজি এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল আমার অপেক্ষায়।

"লালাজির এই ব্যাখ্যার পরও একটা-দুটো প্রশ্ন মনে জেগেছিল। কিন্তু তা আর না-তুলে বললাম, 'যাক, দেখা যখন হয়ে গেছে, তখন বজরায় ওঠো এসে। যেখানে যেতে চাও যেতে-যেতে তোমার সব ব্যাপারটা শুনি।'

"কিন্তু বজরায় উঠতে রাজী হল না লালাজি। বললে, 'না, আমি বজরায় উঠব না। তুমি বজরা এখানে মাঝিদের জিম্মায় বেঁধে রেখে আমার সঙ্গে এসো।'

" 'তোমার সঙ্গে যাব!' এবার সত্যিই একটু অস্বস্তির

সঙ্গে বললাম, 'এখানে এই আঘাটায় নেমে কোথায় যাব তোমার সঙ্গে, আর যাবই বা কেন?'

"'যেতে যেতেই সব বলছি। এসো।' বলে লালাজি অন্ধকারেই আঘাটায় পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

"লালাজির আবদারটা অত্যন্ত বেয়াড়া হলেও অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। লালা রাজারাম এদিকের এই সমস্ত তল্লাটের মস্ত বড় নামী লোক। শুধু অগাধ ধনী শেঠই নয়, মস্ত বড় দাতা। সারা দেশময় সব বড়-বড় শহর আর তীর্থস্থানে কত ধরমশালা যে সে বসিয়েছে তার ঠিক নেই। বাংলাদেশে ভাগীরথীর ধারের সব তীর্থস্থানে এমনি কিছু ধরমশালা বসাবার ব্যবস্থা করবার সময় তার সঙ্গে আমার আলাপটা দোস্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। এরকম একটা সাচ্চা মানুষ আমি খুব কম দেখেছি বলে সাক্ষাৎ দেখাশোনা না হলেও চিঠিপত্রে সে দোস্তিটা আমি ফিকে হয়ে যেতে দিইনি। যত বেয়াড়া আজগুবি মনে হোক, এ-রাত্রে তার ফরমাশ শুনে তার সঙ্গে তাই না-গিয়ে পারলাম না।

"সঙ্গে যেতে যেতে তার কাছে যা শুনলাম তা খুব দুঃখের হলেও একেবারে অভাবিত কিছু নয়। এ অঞ্চলে এখন দারুণ গণ্ডগোল। কুনওয়ারা সিং আরার কাছে জগদীশপুরে কোম্পানির গোরা পল্টনের কাছে হেরে গেছে। তার সঙ্গে যোগ ছিল বলে কোম্পানির ফৌজ রাজারামের জামানিয়ার কুঠির ওপর চড়াও হয়ে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। সেখানে আর তার থাকবার উপায় নেই বলেই লালা রাজারাম আমার জন্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

"'কিন্তু কী দরকার ছিল অত বড় বিপদের পর তোমার এত কষ্ট করে আমার জন্যে এখানে এসে দাঁড়াবার?' আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আমার তো কোনো সত্যিকার দরকার নেই। এই পথে যাচ্ছিলাম বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।'

"'বাঃ!' লালাজি আমার কথায় যেন দুঃখ পেয়ে বললে, 'আমি কথা দিয়েছিলাম না যে, তোমার সঙ্গে দেখা করব? আমার কথার কোনো দাম নেই?'

"লালাজির নরম জায়গাটায় ঘা লাগাবার ভয়ে কথাটা ওইখানেই চাপা দিয়ে এতক্ষণের সত্যিকার যা নিয়ে উৎকণ্ঠা সেই প্রশ্নটাই করলাম। 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

"শুধু আঘাটা দিয়ে উঠে নয়, অন্ধকারে আদাড়-পাদাড় বন-জঙ্গল আর ছড়ানো ইট-পাথরের পোড়ো জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে-খেতে যেভাবে এতক্ষণ এসেছি, তাতে এই প্রশ্নটাই অনেক আগে করার কথা। রাজারামের কথায় বাধা দিতে চাইনি বলেই এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

"প্রশ্নটা শুনে লালাজি মনে হল যেন একটু ঠাট্টার সুরে আমার কথাটাই আবার আউড়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছি? এখুনি দেখতে পাবে।'

"তা সত্যিই পেলাম। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন সামনে একটা কালো পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছে মনে হল।

"পাহাড় নয়, বিরাট একটা সার্বেকি মঞ্জিল। এখন অবশ্য প্রায় ধ্বংসস্তূপ হতে চলেছে।

"তারই ভেতর এ-ঘর ও-ঘর, এ-গলি ও-গলি দিয়ে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লালাজি।

যারা কচি কাঁচা তাদের ত্বকের

নিরাপত্তার জন্য চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

ছোটদের নিয়ে মেলাই ঝক্কি ঝামেলা। আর এক দুর্ভাবনা তাদের কোমল ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা। জীবাণু সংক্রমণের ভয় তাদের ক্ষেত্রেই বেশি। মায়েদের সব ভাবনা থেকে ছুটি দিল বোরোলীন। কাটা ছেঁড়া ফাটায় অনবদ্য। রুক্ষ, শুষ্ক কিংবা ঝলসানো ত্বকেও অদ্ভুত কাজ করে

বোরোলীন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৭০০ ০০৩

"লালাজি অবশ্য যেতে-যেতেই সে কথা আমায় জানিয়েছে। কোম্পানির সে এখন বিষনজরে পড়েছে। কুনওয়ারা সিংয়ের হারের পর কোম্পানির ফৌজ আর চরেরা সিংজির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব যাদের ছিল, নির্মম হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। লালা রাজারাম তাদের কাছে পয়লা নম্বর দুশমন। লালাজিকে তাই এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কোম্পানির হাতে ধরা পড়লেও সোনাদানা হীরা-জহরত নিয়ে তার বিপুল সম্পত্তি যাতে তাদের হাতে না পড়ে তাই লালাজি অনেক খুঁজে-খুঁজে এই পুরনো মঞ্জিলের ধ্বংসস্তূপটা বার করে তার একটা গোপন কামরায় সেগুলো লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। নিজের ভাগ্যদোষে ধরা পড়লে বা মারা গেলেও এই বিপুল ঐশ্বর্য যাতে বেপাত্তা না হয়ে গিয়ে তার বিশ্বাসী ভাল একজনের কাজে লাগে তাই সে আমাকে সে গুপ্ত কামরাটা দেখিয়ে রাখবার জন্যে এনেছে।

"তা এনেছে, ভালই করেছে। কিন্তু সে কামরা আমায় দেখাবে কখন? ঘরের পর ঘর, গলির পর গলি, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা, এই করতে-করতে সব জায়গাটা আমার কাছে গোলকধাঁধার চেয়েও জটিল মনে হচ্ছে যে! রাজারাম নিজে সে কামরা আবার চিনতে পারবে তো?

"সে-প্রশ্নের জবাব যা পেলাম তা কল্পনাতীত। একটা বেশ লম্বা আবছা অন্ধকার ঘুলঘুলি দিয়ে আমায় নিয়ে যেতে যেতে লালাজি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কীরকম বিশ্রী অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, 'এইখানটায়! এইখানটায় আমি নিজেই তারপর হারিয়ে গেছি!'

"এই কথা কটা উচ্চারণের পরই সামনে থেকে সে এক নিমেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

"'লালাজি! লালাজি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

"তার জবাবে প্রথমে একটা বিকট হাসি সমস্ত বাড়িটার ভেতর দিয়ে যেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে গেল। তারপরই লালাজির বিদ্রূপে বাঁকা গলা, 'খোঁজো, খোঁজো বাবুজি। সোনা চাঁদি, হীরা জহরতের বহুত লালচ তোমার দিলের মধ্যে কেমন? খোঁজো, খোঁজো তাহলে জান দিয়ে। আর কিছু না পারো, সেই লুকনো কামরায় হীরা জহরতের ওপর তোমার হাড্ডিগুলো হয়ত সাজানো থাকতে পারবে।'

"'লালাজি! লালাজি!' আমি প্রায় কাঁকিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'এসব তুমি কী বলছ? তুমি এপারের বদলে ওপারেই যদি গিয়ে থাকো, তাহলেও আমার সঙ্গে বেইমানি কি তোমার সাজে? তোমার লুকন্যে দৌলতখানা আমি দেখতে চাই না, তুমি শুধু আমায় এ-গোলকধাঁধা থেকে বার হবার হদিশ বাতলে দাও। বাতলে দাও লালাজি।'

"উত্তরে আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি।

"পাগলের মত এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-গলি থেকে অন্য গলি তারপর ছুটে বেড়াতে লাগলাম। দেয়ালে চৌকাঠে ঠোকা লেগে-লেগে হাত-পা-মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবু বার হবার রাস্তা পেলাম না।

"সত্যিই শেষ পর্যন্ত তা পাব না নাকি? এই অজানা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমার কঙ্কাল চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে থাকবে নাকি?

"অস্থির উৎকণ্ঠায় আর-একবার ছুটে বার হবার চেষ্টা করতেই আলোটা দেখতে পেলাম।

"আলো! তার মানে তো নিশ্চয় মুক্তির উপায়।

"সেই আলোর রেখার দিকে পড়ি কি মরি করে ছুটলাম। আলো পাছে আলেয়া হয়ে যায়, এই ভয়।

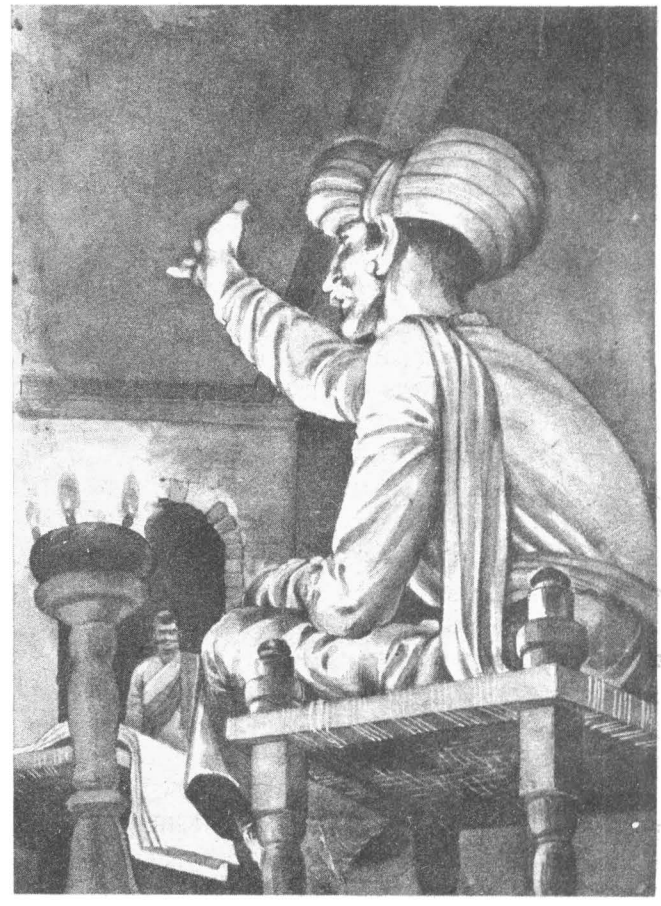

"তা হল না। একটা বাঁক ঘুরতেই আলোটা দেখতে পেলাম। বেশ লম্বা-চওড়া একটা ঘর। ঘরের মধ্যে এক কোণের দিকে দড়িতে বোনা দুটি ছোট চৌকি। তার একটিতে বসে এক প্রৌঢ় সরু লম্বা একটা খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। তাঁর দড়িতে বোনা চৌকির পাশেই বেশ উঁচু মাটির পিলসুজের ওপর একটা প্রায় গোলাকার প্রদীপের মোটা-মোটা কটা সলতে রেড়ির তেলের জোরেই বোধহয় জ্বলছে।

"ঘরটার ভেতর ঢুকে সেখানকার সরঞ্জাম আর অচেনা প্রৌঢ়টিকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

"প্রৌঢ় কিন্তু বিন্দুমাত্র না চমকে, চশমাটা নাকের ওপর থেকে নামাবার সঙ্গে হাতের লম্বা খাতাটা মুড়ে আমাকেই রীতিমতো অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন, বাবুজি। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আমার নাম হল মুনশি মুলুকচাঁদ।'

"আপনার নাম মুনশি মুলুকচাঁদ! আর আপনি এই গোলকধাঁধা-মঞ্জিলে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন?

"কথাগুলো আমার গলা দিয়ে বার হয়নি। আমার চোখ-মুখের চেহারাতেই প্রকাশ পেল।

"মুনশি মুলুকচাঁদ তা ঠিকমতো বুঝে পাশের অন্য দড়ির চৌকিটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'বসুন বাবুজি, ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। আজ আপনার বহুত পরেশানি হয়েছে ঝুটমুট।'

"ঝুটমুট! এবার রাগের জ্বালায় আমার গলায় আবার কথা ফুটল, 'শুধু ঝুটমুট বললে কিছুই বলা হয় না মুনশি মুলুকচাঁদজি। কাউকে নিয়ে এরকম বিশ্রী তামাশা শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়, আর সে শয়তানি যে করেছে তার ঠিকানা এখন এপারের, না ওপারের?'

"আমার এই কথা শুনে মুনশিজি বলেছিলেন, 'যাদের পেছনে ছুটে-ছুটে মাথার অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন, এত-দিনেও তাদের একটু চিনলেন না?'"

মুনশিজি আর মেজকর্তার মধ্যে তারপর যা কথা হয়েছিল, এই বিবরণের শুরুতেই তা কিছুদূর পর্যন্ত দেওয়া আছে। মেজকর্তার নিজের জবানি গোড়া থেকে ধরবার জন্যে যেখানে তা কাটা হয়েছিল, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত মেজকর্তার নিজের কথাতেই আবার বোনা যেতে পারে। মেজকর্তা কথায় কথায় লালা রাজারামের নামটা করায় 'লালা রাজারামের' বলে হেসেছিলেন মুলুকচাঁদ।

মেজকর্তা তাঁর খেরো-খাতায় তারপর লিখেছেন, "মুনশিজির হাসির ধরনে একটু গরম হয়েই বললাম, 'হাসছেন কী? লালা রাজারাম কে তা আপনি জানেন?'

"'তা একটু জানি বইকী!' একটু যেন চাপা বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন মুনশিজি।

"তাতেই আরও জ্বলে উঠে বললাম, 'জানেন, লালা রাজা-রামের কথার কী দাম! লোকে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের চেয়ে তাঁর কথায় বেশি বিশ্বাস করে।'

"'করে নয়, করত।' বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ একটু মুচকি হেসে, 'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি যে, এপারের সঙ্গে ওপারের কোনো মিল নেই। এপারে যে ষোল-আনা সাচ্চা, ওপারে হামেশা সে আঠারো আনা ঝুটা হয়ে যায় স্রেফ মজা করবার জন্যেও।'

"'তা বলে লালা রাজারামও তাই হবে!' অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, 'এই দুদিন আগে দেশের জন্যে যিনি জান দিয়েছেন তাঁর হঠাৎ এমন প্রবৃত্তি!'

"'যদি বলি ওই জান দেওয়াটাও ঝুটা বাহাদুরি!' আগের মতোই মুখ টিপে হেসে বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ। লালাজি কুনওয়ারা সিংকে ছেড়ে কোম্পানিরই শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর জান নিয়েছে কোম্পানির ফৌজ নয়, তাঁর আগের দলেরই লোক বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।'

"'কখ্খনো না। হতে পারে না!' আমি প্রায় মারমুখো হয়ে বললাম, 'কী জানেন আপনি লালা রাজারামের বিষয়ে? কে আপনি?'

"'আমি লালা রাজারামেরই মুনশি। তাই সব জানি।' গম্ভীর হয়ে বললেন মুনশিজি।

"মাথাটা প্রথমে গুলিয়ে গেলেও এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছি। তবু মুনশিজির মুখের দিকে না-চেয়ে নীচের মেঝেতে প্রদীপের আলোর ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বললাম, 'আপনি লালা রাজারামের মুনশি ছিলেন, তাই সব জানেন! কেমন মুনশিজি? আপনি লালাজিকে নিজের দলের সঙ্গে বেইমানি করবার জন্যে তাদের হাতে মরতে দেখেছেন, তারপর ওপারে গেলে সাচ্চারাও সব ঝুটা হয়ে যায় জেনে এখানে আমার মতো নিরীহ মানুষ যাতে লালাজির হাতে বেশি নাকাল না হয়, তাই দেখবার জন্যে এখানে পাহারাদার হয়ে বসে আছেন, এই তো আসল ব্যাপার! না মুনশিজি?

"মুনশিজি এবার খুশি হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বলে গেলাম, 'আপনাকে কিছু আর বলতে হবে না মুনশিজি। আপনি যা করছেন তা অতি মহৎ কাজ। কিন্তু এপারের কারুর পক্ষে ওপারের কারুর ওপর পাহারাদারি করায় বেশ একটু ঝামেলা নেই কি?'

"'তা আছে।' মুনশিজি স্বীকার না করে পারলেন না, 'তবে, মানে.....'

"মুনশিজিকে আবার থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তবে আপনার নিঃস্বার্থ গরজটা বড় বেশি। লালা রাজারামের লুকনো দৌলত-খানা যাতে যার-তার হাতে না পড়ে, তার জন্যে সব কিছু সহ্য করতে আপনি প্রস্তুত।'

"'ঠিক! ঠিক ধরেছেন!' উৎফুল্ল হয়ে বললেন মুনশিজি।

"'কিন্তু তার সঙ্গে আরও যা-যা ধরেছি, সেটাও তাহলে শুনুন।' এবারে সোজা মুনশিজির মুখের ওপর চোখ রেখে বললাম, 'আপনি নিজে আর এপারের কেউ নন। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, আপনি শুধু লালা রাজারামের মুনশি ছিলেন না, কোম্পানির চরও ছিলেন সেই সঙ্গে। আপনার কাছে গোপন খবর পেয়ে কোম্পানি রাজারামজিকে কুনওয়ারা সিংয়ের দলের বলে জেনে তাঁর আস্তানায় চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু তার আগে নিজের ধনদৌলত লুকোবার ব্যবস্থা করে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে লালাজি ভোলেননি। ওপারে যাবার পর আপনার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, ওপারে গেলেই সবজান্তা হওয়া যায় না। তাই রাজারামজির লুকনো দৌলতখানার হদিশ আপনি পাচ্ছেন না। তা পাবার জন্যেই এখানে এসে এমন পাহারা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আপনি ডালে-ডালে বলেই রাজারামজিকে পাতায়-পাতায় যেতে হয়েছে। এতক্ষণে বুঝেছি, আপনাকে হদিশ না-দেবার জন্যে আমার মতো দোস্তের সঙ্গেও বাধ্য হয়ে তাঁকে এমন বিশ্রী চালাকি করতে হয়েছে। তবে যা তিনি করেছেন, তা একেবারে ঝুটমুট নয়। ওই বেয়াড়া রসিকতার ভেতর দিয়েই আমায় আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর লুকনো দৌলত উপযুক্ত হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। আমি সেই চেষ্টাই এবার করব। দেশের জন্যে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর দৌলত দেশের কাজেই যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ওপারের মিথ্যে ছায়াবাজি দিয়ে লালা রাজারামের লুকনো দৌলত-খানা আপনার বংশের কারুর হাতে তুলে দেওয়ার আশা আপনার আর নেই।'

"মুনশি মুলুকচাঁদের ফ্যাকাশে মুখটা তখন প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। সেদিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি যে এপারের নন, সেটা প্রথম কী করে বুঝলাম, তাই ভাবছেন নিশ্চয়। একটা কথা তাহলে আপনাকে বলে যাই। ওপারের হয়ে এপারের সাজতে হলে কায়ার চেয়ে ছায়াটার দিকেই বেশি নজর রাখতে হয়। আপনি এমনিতে আজকের আসরটা ভালই সাজিয়েছিলেন। কিন্তু ধরিয়ে দিয়েছে আপনার ছায়াটা। প্রদীপের আলোয় আপনার ছায়াটা ঠিকমতো পড়তে না-দেখেই আসল ফাঁকিটা ধরে ফেলে আর-সব ব্যাপার আমি বুঝে নিয়েছি। ঠিক যে বুঝেছি, তা তো আপনার ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে যাওয়া থেকেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা, নমস্কারটা তাহলে নিয়ে যান।'"

মেজকর্তার লেখা এখানেই শেষ। যা তিনি লিখে গেছেন, তা সত্য মিথ্যা যাই হোক, তাঁর নিজের হদিশ তিনি এবারে একটু দিয়ে ফেলেননি কি?

কুনওয়ারা সিংয়ের তিনি নাম করেছেন। কুনওয়ারা সিং তো সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিহারের আরা জেলার কাছে তাঁর জগদীশপুরের রাজ্য থেকে কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

মেজকর্তা কি তাহলে সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার মানুষ? তাঁর খেরো-খাতা আর-একটু ভাল করে ঘেঁটে দেখতে হবে।

ছবি বিমল দাশ

ভুতুড়ে কুকুর

আশাপূর্ণা দেবী

আজও বিকেলের বেড়ানো সেরে বাড়ি ফেরার সময় সন্ধের আবছা আলোয় সেই কুকুরটাকে দেখতে পেলেন বজ্রাঙ্গসুন্দর, যেটাকে ক'দিনই দেখতে পাচ্ছেন। নেকড়ে বাঘের মতো বিরাট-কায় এক অ্যালসেশিয়ান। এত বড় কুকুর কেবল খুব বড়লোকের বাড়িতেই দেখা যায়। সেখানে চেনছাড়া হয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, ড্রইংরুমের কার্পেট মাড়িয়ে মাড়িয়ে হাঁটে। বাড়ির আত্মীয়স্বজন কেউ এলে সন্দেহ-সন্দেহ মুখে তাদের বুকের রক্ত হিম করে দিয়ে শুঁকে-শুঁকে দেখে, আর অচেনা কেউ এলে—এমন খ্যাঁকখেঁকিয়ে বিভীষণ আওয়াজ তোলে যে, সে-লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দেয়, এবং দ্বিতীয়বার আর কখনো সে-রাস্তা দিয়ে হাঁটতে চায় না।

এরকম একখানা বাঘা কুকুরকে কখনো বেওয়ারিশ ভাবে রাস্তায় এখানে-সেখানে ঘুরতে দেখা যায় না। অন্তত বজ্রাঙ্গ-সুন্দর কখনো দেখেননি। শুধু তিনিই-বা কেন, এ-পাড়ার আর কেউও বলতে পারল না কখনো এরকম দেখেছে।

নির্ঘাত বেচারির মালিক মরে গেছে।

বলাবলি করেছে কেউ-কেউ। অসতর্কে হারিয়ে টারিয়ে গেলে মালিক কি আর চুপ করে বসে থাকত? পৃথিবী তোলপাড় করে খুঁজে বার করত না? বরং ছেলে হারালে কম খুঁজত, কিন্তু কুকুর? ওরে বাবা।

খাস কলকাতার মাঝখান হলে নিশ্চয় এই বেওয়ারিশ কুকুরটা থানায় জমা পড়ত, কিন্তু শহরতলির এদিকটায় প্রায় মফস্বল-মফস্বল ভাব, কেউ কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। লম্বা-লম্বা রাস্তা বাসে পাঁড়ি দিয়ে অফিস-টফিস যাবার তালে সকাল থেকেই ছুটছে সবাই, কে কার দিকে তাকায়?

তাও যদি কুকুরটা ভয়ঙ্কর কিছু উৎপাতকারী হত, তো লোকের টনক নড়ত, কিন্তু বেচারার ওই চেহারাটাই ভয়ঙ্কর ভাবভঙ্গি নয়। রাস্তা দিয়ে চলে নিঃশব্দে, মাথাটা ঝুঁকিয়ে। মুখে আওয়াজ নেই, কাউকে দেখলে আস্তে পাশ কাটিয়ে যায়। তবে আর তাকে নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

তাছাড়া, দিনের বেলা দৈবাৎই দেখা যায় ওকে, দেখাই যায় না বোধহয়। এই আবছা-আবছা সন্ধেয় একটু এদিক-ওদিক ঘোরে, আবার কখন কোথায় চলে যায়। তবে পরপর ক'দিনই সন্ধেকালে এই বজ্রাঙ্গসুন্দরের গেটের পাশে চুপটি করে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। শুধু কাল আসেনি, আবার আজ এসে বসে আছে। মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিরীহ ভাবে। ওই ভীষণদর্শন মূর্তির সঙ্গে যেটা মোটেই খাপ খায় না। কুকুরটাকে দেখে ভয়ের বদলে মায়াই আসে।

অবিশ্যি সামান্য একটা কুকুরকে ভয় পাবার পাত্তর বজ্রাঙ্গ-সুন্দর নন। বয়েসকালে তিনি নাকি একবার একটা ভাল্লুক মেরেছিলেন। যদিও সেটা শোনা কথা, কিন্তু বিশ্বাস করলেও দোষ নেই।

মীনা বন্ধুকে সাহায্য করলো!

দিনে-দুবার নিউট্রামূল খাওয়া অভ্যেস করলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্যেই দেশের হাজার হাজার লোক সব ছেড়ে এখন আমূলের তৈরী শক্তিবর্ধক পানীয় নিউট্রামূল ধরেছেন।

আমূল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে—আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের ৫০০ গ্রা. টিন মাত্র ১২ টাকা ২১ পয়সা স্থানীয় কর, সেন্টাল সেলস্ ট্যাক্স ও মাশুল আলাদা।

মীনা এবং আরো অনেকে নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে!

আমূল-এর

নিউট্রামূল

প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান!

ভদ্রলোকের বয়েস সত্তর ছাড়িয়েছে, তবু এখনো সোজা সতেজ খাড়া। নাকের নীচে গোঁফজোড়াটি দেখবার মতো। আর চলনে বলনে কী ডাঁট। একদা যে তিনি মিলিটারিম্যান ছিলেন তা এখনো দেখলেই বোঝা যায়।

বিকেলে দু'মাইল হাঁটা বজ্রাঙ্গসুন্দরের বাঁধা নিয়ম, আর ভোরে তিন মাইল। দৈনিক এই পাঁচ মাইল করে হেঁটে খিদে বাড়ান তিনি। অবশ্য বজ্রাঙ্গসুন্দরের ভাইপো আড়ালে চুপি-চুপি বলে, জ্যাঠামশাইয়ের আবার খিদে বাড়ানোর জন্যে বাড়তি এতটা খাটুনির যে কী দরকার! এমনিতেই তো আমাদের চার-জনের মতন খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন।

তা সে তো আড়ালে বলে।

কাজেই বজ্রাঙ্গ বটব্যালের ওই দৈনিক পাঁচ মাইলের ঘাটতি হয় না। তবে সবই ঘড়ির কাঁটা ধরে। বেড়িয়ে ফিরবেন, এক মিনিট নড়চড় হবে না। অথচ বাড়ির একজনও কেউ যদি এরকম নিয়মী-ফিয়মি হন! এই যে বজ্রাঙ্গসুন্দর রোজ বলেন, 'আমি বাড়ি ফেরার আগে গেটের আলোটা যেন জ্বালা থাকে', তা কোনোদিন কারুর মনে থাকে সে-কথা? যেই গেট ঠেলার শব্দ হয়, কিম্বা বজ্রাঙ্গসুন্দরের ভারী জুতোর গমগম আওয়াজটি কানে যায়, তক্ষুনি একসঙ্গে সবাই তৎপর হয়ে ছুটে এসে আলো জেবলে দেয়। তখন শুধু গেটের কেন, গেটের সিঁড়ির তলার, প্যাসেজের, এমন কী বাথরুমের পর্যন্ত, এসে হাতমুখ ধোবেন বলে। কিন্তু ওই যা কথা, সময়ে জ্বালে না। দূরে থেকে এই ছায়া-ছায়া ঝাপসা-ঝাপসা বাড়িটাকেই দেখতে-দেখতে আসতে হয় বজ্রাঙ্গ বটব্যালের। তবে? তবে কিসের জন্যে বজ্রাঙ্গ এমন ছবির মতন বাড়িটি বানিয়ে তার গায়ে খয়েরি বর্ডার দিয়ে-দিয়ে মিহি গোলাপি রং লাগিয়েছেন? দূরে থেকে দেখতেই না বাহার।

অবিশ্যি দিনের বেলায় কি দেখছেন না? বেড়িয়ে ফিরতে, বাজার করে ফিরতে? কিন্তু সে কি রাত্তিরের আলোয় দেখার মতো সুন্দর? ওই সুন্দরটির জন্যেই না বাড়িটির নাম রেখেছেন বটব্যাল 'পরীর ওড়না'।

কিন্তু আজও সেই একই ব্যাপার। গেটের আলো জ্বালা হয়নি। কাজেই গেটের ধারে ঝিমিয়ে বসে-থাকা অ্যালসেশিয়ান-টাও তেমনি ঝাপসা-ঝাপসা, ছায়া-ছায়া।

বজ্রাঙ্গর ইচ্ছে হল গটগটিয়ে বাড়ি ঢুকে হাতের ছড়িটাকে নিয়ে সামনে যাকে পাবেন তাকেই শপাশপ লাগিয়ে দেবেন। তবে বাড়ি ঢোকার আগে আপাতত আলতোভাবে কুকুরটাকে একটু খোঁচা দিলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়? কোথায় গেল সেই বেচারি-বেচারি ভাব। খ্যাঁকখেঁকিয়ে এমন জোর আওয়াজ জুড়ে দিল! ঘৌ ঘৌ ঘৌ ঘৌ! উঃ থামতেই চায় না, যেন দম-দেওয়া কলের পুতুল!

কী ভাগ্যি, তেড়ে কামড়াতে এল না!

অবিশ্যি তাতেও বজ্রাঙ্গ বটব্যাল ভীত হতেন না। আর বরং প্রীতই হলেন একটু এই আওয়াজে। যাই হোক কুকুরটা রুগণ টুগ্‌ন নয়। যা নিরীহ হয়ে পড়ে থাকে! নাঃ, তেজ আছে।

বজ্রাঙ্গসুন্দরের চিরকাল শখ ছিল একটি তেজিয়াল বাঘা কুকুর পুষবেন; সে-শখ আর মিটল না। অন্তত এখনো পর্যন্ত না। দাদারও দাদা থাকে, জ্যাঠারও জেঠি থাকে। বজ্রাঙ্গসুন্দরের জেঠিমা সিংহবাহিনী বটব্যালের হুকুম ছিল, "আমি বেঁচে থাকতে বাড়িতে কুকুর-ফুকুর ঢোকানো চলবে না, এই সাফ বলে দিচ্ছি। 'পারমিশ' দিয়ে যাচ্ছি, আমি সগগে গেলে শখ মেটাস।"

বালক বজ্রাঙ্গসুন্দর তখন শুধুমাত্র 'সুন্দর' হয়ে মধুর হাসি হেসে বলেছিল, "আচ্ছা জেঠিমা, তুমি তো স্বয়ং সিংহ-বাহিনী? তুচ্ছ কুকুরে তোমার এত ভয় কেন?"

সিংহবাহিনী আরও মধুর হাসিতে এক ফোঁটা লঙ্কারঝাল মিশিয়ে বলেছিলেন, "ভয়? ভয় করতে যাব আমি? আমি দুনিয়ার কোনো কিছুকে ভয় করি না বুঝলি? ভূত প্রেত চোর ডাকাত সাপ বাঘ পুলিশ গরমেণ্ট কাউকে না। সাহস থাকে তো একটা সিংহীছানা পোষ না, কোলে নিয়ে ঝিনুকে করে দুধ খাইয়ে দেব। কিন্তু ওই কুকুর? রাম কহো। ওর থেকে নোংরা জীব জগতে আর আছে? শাস্তরে আছে ওদের ছুঁলে নাইতে হয়।"

তখনকার বালক বজ্রাঙ্গ তবুও ছাড়েনি, বলেছিল, "আর যুধিষ্ঠির যে কুকুরকে নিয়ে স্বর্গে ঢুকতে চেয়েছিলেন? তখন তো আর জানতেন না যে, উনি কুকুররূপী ধর্মরাজ!"

কিন্তু সিংহবাহিনীকে যুক্তিতে ঘায়েল করবে সেই ছেলেটা?

সিংহবাহিনী আত্মস্থ গলায় বলেছিলেন, "সগগে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ঠিকই, বলি হাতে করে ছুঁয়েছিলেন, একথা লেখা আছে মহাভারতের কোথাও? পরের সগগে অমন সবাই কুকুর বেড়াল আর ব্যাঙ ঢোকাতে চাইতে পারে। নিজের হলে বুঝতাম। না না, ওসব শখ এখন শিকেয় তুলে রাখ। আমি মরলে তখন শিকে থেকে পাড়িস।"

তা এ পর্যন্ত আর সেই শিকেয় তোলা শখকে শিকে থেকে পেড়ে নামাবার সুযোগ হয়নি বজ্রাঙ্গর, কারণ সিংহ-বাহিনী এখনো খোশমেজাজে বহাল তবিয়তে বেঁকে আছেন। এই বৈশাখে ষেটের কোলে নিরানব্বুই পার করলেন। এক পাও না হেঁটে প্রায় বজ্রাঙ্গসুন্দরের কাছাকাছিই খিদে তেষ্টা। গলার জোর পাড়া ছাড়ায়। তবে মানুষ অমর নয় এই যা ভরসা, কিন্তু...তারপর? মানে তারও পরে?

কুকুর পোষারও তো শেষমেশ একটা বয়েস আছে?

তা পুষতে না পান, পোষণ করতে দোষ কী? তাই বজ্রাঙ্গ-সুন্দর ফটিককে হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, "ক'দিন দেখছি একটা অ্যালসেশিয়ান চুপচাপ গেটের পাশে বসে থাকে, মালিক ব্যাটা মরে-ফরে গেছে বোধহয়, ওটাকে একটু খেতে-টেতে দিস দিকি।"

এখন আবছা অন্ধকারেও তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন বজ্রাঙ্গ বটব্যাল। কিন্তু কুকুরটার সামনে কিছু খেতে দেওয়ার চিহ্ন আছে কিনা, বুঝতে পারলেন না। এদিকে কুকুরটা তার-স্বরে একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। খ্যাঁক খ্যাঁক খৌ খৌ। খ্যাঁক খ্যাঁক খৌ খৌ!

ছড়িটা বাগিয়ে গেট ঠেলে গটগট করে ঢুকে আসছেন বজ্রাঙ্গ, মুহূর্তে গেটের দুশো পাওয়ারের আলোটা জ্বলে উঠল, প্যাসেজের একশো পাওয়ারেরটাও। এমন কী, ফটাফট বাড়ির যেখানে যত আলো ছিল সব। তার মানে বজ্রাঙ্গ বটব্যালের জুতোর শব্দটা ভিতরে বেশ জোর পেঁছে গিয়েছে।

ওদিকে সিংহবাহিনীর গলার জোরও আকাশে উঠেছে, "কোথায় অমন কুকুর চেঁচাচ্ছে রে? বজার বুঝি আমার সগগে যাওয়া অবদি তর সইল না? শখটাকে শিকে থেকে পেড়ে বসেছে?"

'শিকের' ইতিহাস সকলের জানা, তাই বজ্রাঙ্গর ভাইপোর ছেলে রিংকু তাড়াতাড়ি এসে বলে উঠল, "মোটেই না কত্তাদিদা, ওটা রাস্তার কুকুর।"

"রাস্তার! অ! তবু ভাল। তা অমন চেঁচিয়ে মরছে কেন? কেউ বুঝি ঢিল পাটকেল ছুঁড়েছে?"

"কক্ষনো না।" রিংকু রেগে ওঠে, "আমি কেন ঢিল ছুঁড়তে যাব? আমি কি তেমনি ছাই-ছেলে?"

সিংহবাহিনী ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলেন, "এ মা!

এ যে সেই ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি।...তুই ছুঁড়ে-ছিস বলেছি?"

"বাঃ, কাকে বললে তবে?" রিংকু বলে, "'কেউ' মানে কী?"

"'কেউ' মানে তোদের জমাদারটাও হতে পারে?"

এই সময় হঠাৎ ডাকটা বন্ধ হয়ে গেল।

কোলের উপর গোলগাল তাকিয়াটি বাগিয়ে ধরে গুছিয়ে বসে সিংহবাহিনী বলেন, "আঃ! বাঁচা গেল! থামল হতভাগাটা। কানের মধ্যে যেন রোসুন চৌকি বাজাচ্ছিল!"

বিছানার-ধারে-রাখা টুল থেকে শিশি খুলে একমুঠো কিসমিস বার করে নিয়ে হাতটা বাড়ান, "নে, খা!"

এটি রিংকুর বরাদ্দ।

কত্তামার ঘরে তার জন্যে অনেক কিছু বস্তু মজুত থাকে। কিসমিস, আমসত্ত্ব, মোরব্বা, ছড়া-তেঁতুল, ডালমুট, কাজুবাদাম।

কুকুরের সেই পরিত্রাহি চিৎকারটা থেমে যাওয়ায় বজ্রাঙ্গ বটব্যালের বজ্রকণ্ঠটি 'পরীর-ওড়না'র ছাদ ফাটায়।

"ফটকে! এই ফটকে! ফের আজ সেই এক কাজ? আলো জেবলে রাখিসনি কেন? ভেবেছিস কী, অ্যাঁ? ভেবেছিস কী?"

ফটিক মিনমিনে গলায় বলে, "এই তো জ্বালতে আসছি! এই তো ভগমানের আলোটা ফুরলো।"

বজ্রাঙ্গ হাতের ছড়িটা নাচিয়ে বলেন, "রোজ এক কথা? ভগবানের আলো! ভগবানের আলো না ফুরোলে কী হয়? কাল থেকে বিকেলবেলা রোদ থাকতে আলো জেবলে রাখবি! বাস!"

ফটিক এখন হঠাৎ সতেজে বলে ওঠে, "আপনি তো বলে দিলেন, বাস! আর ওদিকে কত্তামা বলে রেখেছেন 'বাস'। কোন 'বাস'টা মানব বলেন?"

কত্তামা!

বজ্রাঙ্গ বটব্যাল ঝপ করে বাসি মুড়ির মতন মিইয়ে গিয়ে বলেন, "কত্তামা আবার কী বলতে গেলেন?"

"কী না বলতে গেলেন? কোন্ কথাটায় উনি কিছু না বলতে আসেন? উনিই তো বলে দেছেন। তুলসীতলায় পিদিপ দেবার আগে বাড়ির কোনোখানে আলো জ্বালা চলবে না, বাস! আর এদিকে আবার ভগমানের আলো থাকতে থাকতে তুলসী-তলায় পিদিপ দেওয়াও চলবে না। মাসিমা তেল-সলতে সাজিয়ে পিদিপ নিয়ে চোদ্দবার শুধোবে, 'ঠাকুমা এখন পিদিপ দেব?' ...যতক্ষণে কত্তামার হুকুম হবে--ততক্ষণে দেশলাইয়ে কাঠি ঘষবে।"

বজ্রাঙ্গ বটব্যাল তাড়াতাড়ি বলেন, "সে তো ঠিকই করেন, সে তো ঠিকই করেন। তা তুমি ব্যাটা ওই কুকুরটাকে কিছু খেতে দিয়েছিলে?"

"ও! ওই যক্ষীর মতন বসে থাকা বাঘাটাকে?" ফটিক মুখ বাঁকিয়ে বলে, "ওই নবাবপুত্তুরকে কে কী খেতে দেবে? রোজই তো খাবার নিয়ে মুখের সামনে ঢেলে দিই, তা বাবু শুঁকে পর্যন্ত দেখেন না। মুখ ঘুরিয়ে উল্টোমুখো বসেন।"

বজ্রাঙ্গ বটব্যালের ভুরুটা কুঁচকে এল, গোঁফ জোড়াটা নেচে উঠল, "কী খেতে দিয়েছিলে শুনি ব্যাটা শাহানশা বাহাদুর?"

শাহানশা বাহাদুর! এই নামে ডাকা হচ্ছে ফটিককে? এত অপমান সইবে ফটিক কেন? একসময়ে সে না হয় 'মাকড়দা' গ্রামের একটা হাবাগোবা হাঁ-করা ছেলে ছিল, তখন তোমরা যা বলেছ সয়ে গেছে। কিন্তু এখন? এখন ফটিক ধুতি-গেঞ্জির কথা ভুলে গেছে, মাথায় জবজবে করে তেল মাখার পাট উঠিয়ে দিয়েছে, বাড়িতে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, পায়জামা, বাইরে বুশ শার্ট, ট্রাউজার—এছাড়া ভাবতেই পারে না। এখন ফটিকের বাসিরুটি খেলে (আগে রুটি বাড়লেই ফটিকের স্ফূর্তি বাড়ত) পেট ব্যথা করে, কাঁটামাছ খেলে মাথা ধরে।...এখন টেলিফোন বেজে উঠলে ফটিক আগে এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরে কায়দা-কায়দা গলায় বলে ওঠে, "হ্যালো! কে বলছেন?"

আর টেলিভিশনটা যাতে ফাঁক না যায়, তার জন্যে বিকেলে তাড়াতাড়ি সংসারের কাজ সেরে নেয়। এবং সময় পেলেই রহস্যমালা সিরিজের গল্পের বই পড়ে। এ বাড়িতে আসার আগে শুধু 'পেথমেথম ভাগ' পড়া ছিল তার। এখন সে-দিন নেই। খবরের কাগজ এলেই সব-আগে ফটিক পাট খোলে। সেই ফটিককে শাহানশা-ফাহানশা? মেজাজ ঠিক থাকবে কেন? ফটিক বেজার মুখে বলে, "কুকুরকে আবার কী খেতে দেয় মানুষ? মাংসের হাড়গোড়ই দিয়েছি।"

বজ্রাঙ্গ বটব্যাল ছড়ি নাচিয়ে বলেন, "ওঃ! মাংসের হাড়-গোড়? পাত-কুড়োনো বোধহয়?"

"তবে না তো কী? পেসার কুকারে আলাদা রান্না করে মোগলাই কোর্মা দেব?"

ফটিকের মুখে এরকম তেজিয়ান কথা?

বজ্রাঙ্গসুন্দর বটব্যালের গলা এখন আকাশে ওঠে, "হ্যাঁ, তাই দেবে। রোজ সকালবেলা আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাফ-কিলো করে পিওর মাংস নিয়ে এসে ওর জন্যে মশলাদার করে

রে'ধে রাখবে, বুঝলে? সন্ধেবেলা যখন আসবে, গরম ভাতের সঙ্গে মেখে—"

"কুকুর গরম ভাত খায়?"

"আলবাত খায়! কে বলেছে খায় না? কুকুর বলে এত অবজ্ঞা কিসের? কুকুর মানুষ নয়?"

মানুষ!

ফটিক হাসি চাপবার চেষ্টায় খকখকিয়ে কাসতে শুরু করে দেয়। কে জানে বাবা, বড়দাদুর মুখের সামনে হেসে উঠলে ফটিকের দাঁত ক'টা আস্ত থাকবে কিনা।

ওদিকে এতক্ষণ খকখকিয়ে কাসছিলেন সিংহবাহিনী, তাঁর কাসি থেমে যায়। এখন তাঁর কাঁসির মতো গলার স্বর ভেসে আসে। "কুকুর আবার মানুষ হলো কবে থেকে রে বজা, কোন 'ডিকসেনারিতে' বলেছে, বলি তাকে রোজ-রোজ আদর করে তোর ওই পুয়োর মাংস আর গরম ভাত খাওয়ালে—সে-আর বাড়ি ছাড়বে?"

ফটিক চেঁচিয়ে বলে, "কত্তামা, 'পুয়োর' নয়, 'পিওর'। মানে খাঁটি।"

"থাম থাম, তুই আর আমায় মানে শেখাতে আসিসনি ফটকে! আমি শুধোচ্ছি, রাস্তার কুকুরকে রোজ-রোজ আদর করে বসিয়ে খাওয়ালে সে আর তোদের বাড়ি ছাড়বে?"

বজ্রাঙ্গর গোঁফ ঝুলে পড়ে, হাতের ছড়ি হেঁটমুণ্ড হয়, এগিয়ে গিয়ে জেঠিমার দরজায় দাঁড়িয়ে করুণ গলায় তিনি বলেন, "তাই বলে একটা কেষ্টর জীব না-খেয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চোখে দেখা হবে?"

"না দেখতে পারিস, চোখ বুজে থাক। জগতে কত কেষ্টর জীব অমন না-খেয়ে ঘুরছে। যাকগে, বলছিস যখন তাই হবে। ফটকে, বড়বাবু যা বলেছে তাই করবি, হাফ কিলো কেন এক কিলো আনবি, রাঁধবি, খাওয়াবি। কিন্তু, খবরদার, যেন বাড়ির গেট না ডিঙোয়। এই আমার সাফ কথা। ব্যস।"

বজ্রাঙ্গ গোঁফের-ফাঁকের হাসি লুকিয়ে সরে এসে ফটিককে বলেন, "শুনলি তো হুকুম? কাল থেকে যেন মনে থাকে। যাক আজ এখন যা আছে খেতে দিগে যা।"

ফটিক একপাক ঘুরে আসে। তারপর দু'হাত উল্টে বলে, "কোথায় আপনার 'আলসেশন' বড়দাদু? সে বোধহয় সেই চিল্লাতে-চিল্লাতেই হাওয়া হয়ে গেছে।"

বজ্রাঙ্গ গুম হয়ে যান।

তাইতো। খোঁচা দেওয়াটা বোধহয় ভাল কাজ হয়নি। যতই হোক, ওদেরও একটা প্রেস্টিজ আছে। তাছাড়া নিশ্চয় খুব বড় ঘরে মানুষ হওয়া ছেলে। বজ্রাঙ্গ কি কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন? 'একটি সম্ভ্রান্ত অ্যালসেশিয়ান পাওয়া গিয়াছে' বলে?

কিন্তু—

বজ্রাঙ্গ বটব্যাল ভাবনাটাকে থামালেন, বিজ্ঞাপন তো যার 'হারাইয়াছে', সেই দেয়—এটা উল্টো হচ্ছে না? আর যদি মালিক সত্যিই মরে গিয়ে থাকে? কে সাড়া দেবে সেই ডাকে? তাছাড়া ধরো যদি কেউ হঠাৎ নিতেই আসে? কী দেবেন বজ্রাঙ্গ তার হাতে? ওই খামখেয়ালি জীবটার তো আসা-যাওয়ার ঠিক নেই। নাঃ, ও হবে না। ওই রোজ কিছু করে খেতে দিতে হবে—কেষ্টর জীবটাকে।

কিন্তু আর কি আসবে?

বজ্রাঙ্গর মনটা হাহাকার করে ওঠে।

ছড়ির খোঁচা দেওয়াটা ভাল হয়নি। (ক্রমশ)

ছবি সুধীর মৈত্র

মিউজিয়ামে

সরল দে

ঝিম্-ধরা এক হিম-ঝরা রাত
আবছা আলো-আঁধার।
মিউজিয়ামে আদিম ছায়া
জট পাকাল ধাঁধার।

একটা নড়ে, একটা চড়ে,
একটা কেঁদে ভাসায়।
মুণ্ডু নাচে একটা ধড়ে,
একটা খালি হাসায়।

একটা মমি হঠাৎ জেগে
ফেট্টি খুলে দাঁড়ায়,
হাড়-খটাখট শব্দ ওঠে
ঠ্যাং যদি সে বাড়ায়।

হাতড়ে খোঁজে ঘুমের বড়ি
হটেনটুটেন ফ্যারাও।
ম্যামথ বলে, ফ্যারাও-দাদা,
একটু ঘুরে বেড়াও ॥

ছবি অনুপ রায়

তোমাদের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

আনন্দমেলা

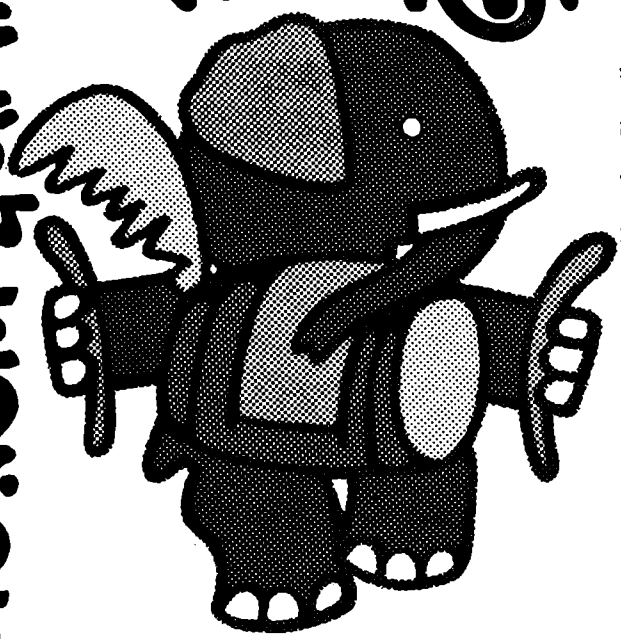

গল্প

সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, জরাসন্ধ
লীলা মজুমদার, সন্তোষকুমার ঘোষ
সমরেশ বসু, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
নবনীতা দেবসেন
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাপদ রায়, শেখর বসু

ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়
ও আরও অনেকে

পরীক্ষার্থীদের জন্য

চারজন হেড এগজামিনারের লেখা
'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'
সেইসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে
'কী ভাবে উত্তর লিখতে হয়'
এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ
কেশবচন্দ্র নাগ, কিরণচন্দ্র চৌধুরী
পি আচার্য, লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী
কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত
পি মাহাতো, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
পি. কে. দত্ত, রমাপ্রসাদ সরকার।
এ-ছাড়া আরও লেখা, ধাঁধাঁ, ছবি ও
অনেক অনেক মজা

উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়ের
সুবিশাল শঙ্কু-কাহিনী ছাড়াও
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিমল মিত্র
বিমল কর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ
এবং
'গোয়েন্দা বাজ'-এর পুরো
একটি চিত্রকাহিনী

বড় গল্প

আশাপূর্ণা দেবী

ভ্রমণকাহিনী

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.৭০

তোমাদের কপির জন্য আজই এজেন্টকে
বলে রাখো বা আমাদের লেখো ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার,
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

AAM/CAS-6/78 BEN

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ১২ ॥

জলে আমার বড্ড ভয় ছিল। ঠিক জলে নয়, বৃষ্টিতে। ঘর-পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, আমিও তেমন ভয় পেতুম আকাশে মেঘ দেখলে। মেঘ না-থাকলেও আমার মনে হত—এই বুঝি মেঘ করল, এই বুঝি বৃষ্টি নামবে।

মনে এই রোগটা ধরে গিয়েছিল খেলারই কারণে। বৃষ্টির দিন খেলা হলেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলতেন, "আজ ভিজে মাঠ, চুনী ভাল খেলতে পারবে না, সত্তারকে খেলাও।" মনটা খারাপ হয়ে যেত। ভাবতুম জাতীয় ফুটবলে এত ভাল খেললুম, দূরপ্রাচ্য সফরে সত্তারদার বদলে লেফট ইনে খেলে এত প্রতিষ্ঠা পেলুম, তবু ছাপ্পান্নর মরসুমে আবার কেন আমার এই অগ্নিপরীক্ষা।

অবশ্য মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষেরও অসুবিধা ছিল। সত্তারদা কত বড় খেলোয়াড়। কত তাঁর অভিজ্ঞতা। যদিও তখন তাঁর গৌরব-গরিমায় একটু ভাটার টান, তবু গুরুত্বপূর্ণ লীগ ম্যাচে তাঁর বদলে আমাকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাইতেন না কর্মকর্তারা। তাই সাধারণ লীগ-ম্যাচগুলিতে আমি নিয়মিত খেললেও একটু কড়া ধরনের ম্যাচে এবং বৃষ্টির দিনে আমাকে মাঠের পাশে বসেই সময় কাটাতে হত। আর আকাশে মেঘ দেখলেই ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যেত। তাই মাঝেমাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হয়তো ঘরে বসে পড়ছি, সূর্যদেব সাময়িক চোখ বুজেছেন, আমি জানালার ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখতুম বৃষ্টি পড়ছে কিনা। আর যেদিন সত্যি সত্যিই বৃষ্টি হত, আমার কিছুই ভাল লাগত না। ভাবতুম কেন বৃষ্টি নিয়ে কবিদের এত কবিত্ব, সাহিত্যিকদের কলমে এত উচ্ছ্বাস। বৃষ্টির যদি নামতেই হয়, অন্য খেলার দিন কিংবা রাত্রিতে নামতে পারে না? মোহন-বাগানের খেলার দিন নামতে হবে কেন? আমার প্রথম জীবনের ফুটবলের এই সব কথা ভেবে পরে আমি নিজেই হেসেছি। তোমরাও হয়তো ভাবছ, কী ছেলেমানুষি আমাকে পেয়ে বসেছিল। আরও ছেলেমানুষির কথা শুনতে পাবে পরে। শুনে হয়তো তোমরাও হাসবে।

ছাপ্পান্নর হালকা ম্যাচ খেলতে-খেলতেই মোহনবাগানের প্রথম টীমে অপরিহার্য হয়ে উঠলুম। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ খেলেছিলুম। খেলেছিলুম ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ফিরতি লীগের চ্যারিটি ম্যাচেও। নিশ্চয়ই ওটা আমার জীবনের মস্ত এক গুরুত্বপূর্ণ খেলা। কিন্তু মহমেডানের সঙ্গেও না, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গেও না, ওই মরসুমে আমার স্মরণীয় খেলা ছিল এরিয়ানের বিরুদ্ধে পাল্টা লীগে এবং শীল্ড ফাইনালে। এবং বলবার কথা, লীগের পাল্টা খেলাটি ছিল বৃষ্টিভেজা মাঠেই।

এরিয়ান তখন যথেষ্ট শক্তিশালী। গোলকীপার সনৎ শেঠ, ব্যাক ভব রায় ও জোনস, হাফব্যাক সুভাষ সর্বাধিকারী ও পল্ম মিত্র, ফরোয়ার্ড মেওয়ালাল, সন্তোষ দেবগুপ্ত, রঞ্জিত বসু প্রভৃতিকে নিয়ে চমৎকার টীম। দলের প্রকৃত শক্তি যতখানি; মোহনবাগানের চোখে শক্তি ছিল তার চেয়েও বেশি। কারণ, প্রায় একই সময়ে উত্তর কলকাতায় দুটি ক্লাবের জন্ম, একই বছরে প্রথম ডিভিশনে খেলা আরম্ভ। তাই রেষারেষিও শুরু থেকে। সেটা দারুণ বেড়ে যায় ১৯৪০ সালে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে এরিয়ানের কাছে ৪—১ গোলে মোহনবাগানের পরাজয়ের পর। আমরা ক্লাবে ওই খেলাটির কথা মাঝেমাঝেই শুনতুম। আর যখনই এরিয়ানের সঙ্গে খেলা পড়ত, সবাই বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠতেন। এখন মোহনবাগানের সঙ্গে এরিয়ানের খেলার গুরুত্ব থাকলেও আগের মতো নেই। আমরা যখন খেলেছি, তার আগে থেকে প্রতিটি ম্যাচের পৃথক আকর্ষণ, পৃথক গুরুত্ব ছিল। চল্লিশের পর ছাপ্পান্ন সালের শীল্ড ফাইনালে মোহন-বাগান দ্বিতীয়বার এরিয়ানের মুখোমুখি হল। তাই ষোল বছর আগের ব্যথাটা মোহনবাগান-সমর্থকদের মধ্যে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বিশেষ করে চিন্তার কারণ হয়েছিল পাল্টা লীগে এরিয়ান দারুণ লড়েছিল বলে। আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই পরাজয়ের শোধ তুলতেই হবে।

শোধ অবশ্যই তুলেছিলুম। দুটি খেলাতেই আমরা জিতেছিলুম। পাল্টা লীগের খেলায় কিন্তু মরণপণ সংগ্রামে, ৪—৩ গোলে; শীল্ড ফাইনালে অতি সহজে ৪—০ গোলে। লীগে অত ভাল খেলার পর এরিয়ান শীল্ড ফাইনালে কেন মিইয়ে পড়ল বুঝতে পারিনি। লীগে আমরা অবশ্য প্রথম থেকেই দাপটে আক্রমণ চালিয়েছিলুম, যাতে এরিয়ান নিজেদের গুছিয়ে নিতে না পারে। কিন্তু আমাদের মাঝেমাঝেই মনে হচ্ছিল চল্লিশের শীল্ডবিজয়ী সেই এরিয়ান দলই বুঝি নতুন রূপ ধরে মাঠে নেমেছে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ছন্দে, গতির চমকে এবং সুযোগ তৈরি ও সেই সুযোগ ব্যর্থ করার নাটকীয়তায় সে কী দারুণ খেলা। একবার আমরা গোল করি, একবার ওরা গোল করে। এইভাবেই চলছিল। তখন খেলা হত ৫০ মিনিট। ৩+২+৫ বা ৪+২+৪ ছকের খেলা ছিল না। এ দুটিই রক্ষণমূলক ছক। আমরা খেলতুম ২+৩+৫ ছকে; অর্থাৎ আক্রমণাত্মক ফুটবলের ট্যাকটিকসে।

এবার আর্জেন্টিনা ও হল্যান্ডের মধ্যে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার ধারাবিবরণী তোমরাও শুনেছ, আমিও শুনেছি, টেলিভিশনেও খেলা দেখেছি। ধারা-বিবরণীতে বেতার ভাষ্যকার বার বার বলেছেন—এক্সপ্লোসিভ ফুটবল, একসাইটিং ফুটবল। এক্সপ্লোসিভ ফুটবল কী? না, যে-খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘাতে বিস্ফোরণের মত সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে চমকের উপর চমক সৃষ্টি করে। শটে-হেডে-আক্রমণে ও প্রতি-আক্রমণে প্রতি মুহূর্তে টের পাওয়া যায় বিস্ফোরণের ভয়ঙ্করতা। স্বীকার করছি, ফুটবলের টেকনিক-ট্যাকটিকসে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। শুধু গোলকীপার বাদে বাকি দশজনের উপর দায়িত্ব এসে পড়েছে, নিজের পজিশনেই শুধু না খেলে সারা মাঠে ছড়িয়ে খেলার। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, এখনকার খেলার মূল ধারাটাই রক্ষণমূলক। ২+৩+৫ ছকে আক্রমণ ছিল আরও তীব্র। এখন চার ব্যাকের দেওয়াল, যুদ্ধের সময়কার ব্যাফল ওয়ালের মতো। বাংলায় আমরা বলতুম 'বিফল-ওয়াল'। এই বিফল-ওয়াল ভেঙে আক্রমণ শানানো শক্ত। আবার আক্রমণও তো সব সময় জোরালো হয় না, ফরোয়ার্ডে তিনজন বা চারজন খেলোয়াড় খেলে বলে। আগে পাঁচজন ফরোয়ার্ডের সমবেত আক্রমণের চাপ সামলাত প্রধানত দুজন ব্যাক। তাতে আক্রমণে যেমন ছন্দ ও গতি ফুটে উঠত, তেমন আক্রমণ প্রতি-রোধের মধ্যে ফুটে উঠত দুই ব্যাকের বিক্রম। সে-খেলা দেখার

একটা আলাদা মজা ছিল। মোহনবাগান ও এরিয়ানের ফিরতি লীগের খেলায় সেই মজা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছিলেন দর্শকরা। মাঠ ভিজে ছিল বলে বল পড়েই ভীষণ জোরে ছুটছিল। এক কথায় বলব, খেলাটি উঠেছিল গতির তুঙ্গে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল যুদ্ধের মেজাজ।

খেলার দিন সকাল থেকেই জোর বৃষ্টি পড়ছিল। মনে সন্দেহ ছিল আমি দলে থাকব কিনা। ওই খেলার পর থেকেই আমার বৃষ্টি-ভয়টা কাটতে থাকে। আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। ৩-৩ গোলে সমান-সমান অবস্থায় থাকার পর এরিয়ানের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি আমিই করেছিলুম একটি ভলিতে। শটটির কথা আমার আজও মনে আছে। ইডেন গার্ডেনসের দিকের গোল পোস্টে লেগে বল গোলে ঢুকেছিল। এরিয়ানের গোলকীপার সনৎ শেঠ বল প্রতিরোধের কোন সুযোগই পাননি। শীল্ড ফাইনালে এরিয়ানের বিরুদ্ধে চারটি গোলের একটিও কিন্তু আমি করতে পারিনি। তিনটি গোল করেছিল কেষ্ট পাল, একটি হয়েছিল এরিয়ানের আত্মঘাতী গোল, পরী চ্যাটার্জির শট থেকে। কিন্তু ফাইনালে আমি যে ভলিটি মেরেছিলুম তা থেকে গোল না-হবার দুঃখ আজও ভুলতে পারিনি। প্রায় মাঝ মাঠ থেকে ভলি নিয়েছিলুম নিখুঁত সময়ে। সনৎ বলটি আটকাতে পারেননি, তাঁর গায়ে লেগে এবং পরে বারে লেগে ছিটকে উপর দিয়ে চলে যায়। আজ লেখার সময় যেন সেই ছবিটি ভেসে উঠছে।

হ্যাঁ, একটা মজার কথা তোমাদের জানাচ্ছি। লীগে এরিয়ান সত্যিই দারুণ খেলেছিল। মেওয়ালাল তিনটি গোলের দুটি করেছিলেন। একটি কিন্তু হ্যান্ডবল করে। ভারী চালাক ছিলেন। পরে ওই হ্যান্ডবলের কথা স্বীকারও করেছেন অকপটে।

আমরা সবাই "মেওয়াদা" বলে ডাকতুম। মান্নাদা ও মেওয়াদা সমসাময়িক খেলোয়াড়। ওঁর খেলার কত কথাই তো শুনেছ। ১৯৫১ সালে দিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমসের ফুটবল ফাইনালে ইরানের বিরুদ্ধে ভলিতে চমৎকার গোল করেছিলেন। তার আগে গিয়েছিলেন লন্ডন অলিম্পিকসে। বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রচুর গোল করেছেন। আমার বড় ভাল লাগত মেওয়াদার ভলিশট। তার চেয়েও ভাল লাগত ওঁর ব্যবহার। প্রাণ-চাঞ্চল্যে সবসময়ই টগবগ করতেন। মুখে "ম্যাকলিনস" হাসিটি লেগে থাকত। ম্যাকলিনস হাসি কী বুঝতে পারলে তো? টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে দাঁত-বার-করা মুখের ধপধপে সাদা সুন্দর হাসিটি দ্যাখোনি?

মেওয়াদা অবশ্য মস্তমাপের সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন না। পায়ে জোর শটও ছিল না। দু তিনজনকে ডজ করে বল বেশিদূর টেনে নিয়ে যেতে পারতেন না। বেঁটেখাটো লোক বলে হেড করার ক্ষমতা ছিল কম। কিন্তু ঠিক সময়ে রাইট আউট ও লেফট আউটকে লম্বা করে বল পাঠাবার ক্ষমতা ছিল। দলকে খেলাতেন, নিজে খেলতেন। অনুমান - শক্তি ছিল প্রখর। সব চেয়ে যেটা বড় জিনিস ছিল তা হচ্ছে— অর্ধেক সুযোগকে পূর্ণ সুযোগে পরিণত করে ভলিতে বা স্লেসিংয়ে কিংবা ব্যাক কিকে গোল করার অসাধারণ ক্ষমতা।

মান্নাদার সঙ্গে ভাবও যত ছিল, রেষারেষিও তত ছিল। কারণ মেওয়াদা ছিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ড, মান্নাদা ব্যাক। মেওয়াদা যখন ইস্টার্ন রেলে খেলতেন তখনো যেমন, যখন এরিয়ানে খেলতেন তখনো তেমন, দুজন দুজনকে ফাঁকি দিতে চাইতেন।

এরিয়ানের সঙ্গে ওই লীগ খেলার দিন মান্নাদা বললেন, "আজ আমার একটা দাঁতও থাকবে না।" আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "এই ব্যাটা মেওয়া একবারও আমার মাথার উপর থেকে বল নিতে পারে না, অথচ ঢুঁ মেরে-মেরে আমার দাঁতগুলো আলগা করে দিয়েছে।" মেওয়াদার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "এই মেওয়া, আজ কিন্তু ঢুঁ মারবি না।" উত্তরে, "ঠিক আছে" বলে হাত উঁচু করে সেই ম্যাকলিনস হাসিটি দেখিয়েছিলেন মেওয়াদা।

পরে ওই গোল সম্পর্কে স্বীকারোক্তির সময় মেওয়াদা বলেছেন, "কী করব, মান্নাদা আমাকে ঢুঁ মারতে বারণ করে দিলেন। আর ওঁর মাথার উপর থেকে বল তো আমি নিতেও পারতুম না। তাই উনি যখন হেড করতে লাফালেন আমি আমার ছোট দেহটা লম্বা করে উপরে তুললুম। টুক করে মাথার পাশে হাত দিয়ে বলটা নামিয়ে নিয়ে গোলে শট করে দিলুম। রেফারী পিছনে ছিলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। গোলকীপার এস চ্যাটার্জি গোল খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। প্রতিবাদ অবশ্য করেছিলেন। কিন্তু যে হ্যান্ডবল রেফারী দেখতে পাননি, তা দেবেন কী ভাবে?"

মেওয়াদার এই দুষ্টুবুদ্ধির পরিচয় আরও কয়েকটি খেলায় আমরা পেয়েছি। কিন্তু ওঁর একটা মস্ত গুণ ছিল। ওঁর বিরুদ্ধে হ্যান্ডবল বা ফাউলের নির্দেশ দিলে নিজেই দৌড়ে গিয়ে বলটি বসিয়ে দিতেন প্রতিপক্ষকে ফ্রী কিক করতে দেবার জন্য। চমৎকার লোক ছিলেন। এখনো আছেন। এখনো সেই প্রাণচঞ্চল পুরুষ।

এরিয়ানের সন্তোষ দেবগুপ্তর কথা বলেছি। ইনে বেশ ভাল খেলত। খেলত চশমা পরে। চশমা খুললে কিছুই দেখতে পেত না। একবার আমাদের সঙ্গে খেলায় চোখ থেকে ওর চশমা খুলে পড়ে গেল। অন্ধের মত ঘাসের উপর খুঁজতে আরম্ভ করল চশমা। দেখতেই পাচ্ছে না কোথায় চশমা পড়েছে। শেষে আমাদেরই একজন খেলোয়াড় কুড়িয়ে ওর হাতে তুলে দিল। এবার চশমা পরে সন্তোষ খেলতে আরম্ভ করল দ্বিগুণ তেজে। আমাদের কে একজন ওকে শুনিয়েই বলল, "চশমাটা লুকিয়ে রাখলেই ভাল হত। ও এত ভাল খেলবে কে জানে।" দ্যাখো, যেখানে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে সেখানেও কেমন রসিকতা চলে পাশাপাশি।

ওই বছরই খেলার ডাক পেলুম দিল্লিতে। দিল্লিতে আমার প্রথম খেলা এবং প্রথম ভারত দলের প্রতিনিধিত্ব। ওটা অলিম্পিকের বছর। চীনা অলিম্পিক দল এসেছিল ভারত সফরে। দিল্লির দলটি গড়া হয়েছিল সারা ভারতের খেলোয়াড়দের নিয়ে। বাংলা থেকে দলে ছিলুম আমি, পি কে, নিখিল নন্দী আর মেওয়ালাল। খেলায় ভারতীয় দল ১—০ গোলে হেরে গিয়েছিল। আমার খেলায় আমি নিজে খুশি হতে না-পারলেও শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা কিছু বেড়ে গিয়েছিল এবং শুনেছিলুম মেলবোর্ন অলিম্পিকসের জন্য আমাকে ক্যাম্পে ডাকা হবে।

ওই সময়ে দিল্লির একটি ঘটনা আজ মনে পড়ছে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল 'মোতিমহল হোটেলে'—তন্দুরি চিকেনের জন্য বিখ্যাত মোতিমহল রেস্তোরাঁয় নয়। তার অপর দিকের হোটেলে। অতি সাধারণ হোটেল, সেখানে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু ছিল না। কিছুদিন আগেই তো আমরা দূরপ্রাচ্য সফরে বিরাট-বিরাট হোটেলে থেকে এসেছি। তাই দিল্লির ওই হোটেলে আমাদের অসুবিধার কথা বলতেই মেজর লক্ষ্মণ সিং চটে উঠে বললেন, "আরে ইয়ে কামাল হ্যায়—ফুটবলই তো খেলনা, কই আয়েস তো নেই করনা।" লক্ষ্মণ সিং ছিলেন দিল্লি ফুটবলের বড় কর্মকর্তা। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন সম্পাদক। মিলিটারি মানুষ। মেজাজটাও ছিল রুক্ষ। ওঁর কড়া কথা আমাদের কানে মোটেই ভাল লাগল না। গোলমালের আঁচ পেয়ে মেওয়াদাই ছুটে এসে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন। আমাদের সময়

মেওয়ালাল (এখন) শৈলেন মান্না (এখন)

রহিম-সাহেবের কোচিং (ডাইনে থেকে তৃতীয় স্থানে চুনী)

খেলোয়াড়রা যে সুযোগ-সুবিধা পায়নি, এখনকার খেলোয়াড়রা সেটা পাচ্ছে দেখে আমি সত্যিই খুশি।

হ্যাঁ, এবার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আমার প্রথম খেলাটির কথা বলি। আগেই বলেছি ওটা ছিল ফিরতি লীগের খেলা। যে-ম্যাচ নিয়ে এত হই-চই, সারা শহর পাগল, সেই ম্যাচে আমি খেলছি একথা জানার পর কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলুম। আগের দিন ঘুমুতে পারিনি, ভালভাবে খেতে পারিনি, স্থির হয়ে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারিনি। কেবলই ভেবেছি, বৃষ্টি হবে না তো? বৃষ্টি হলে আমাকে বসিয়ে দেবে না তো? যদি একটা ভলি মারার সুযোগ পাই কীভাবে মারব?

চিন্তাটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলাইদা। বলেছিলেন, "মোহনবাগান থেকে বদরু অলিম্পিকে যাবেই। ও তো খেলবে রাইট ইনে। লেফট ইনে তোমার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী তারা দুজনই কাল খেলবে তোমার বিরুদ্ধে। ওরা তোমাকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। মনে থাকে যেন। ওদের চেয়ে ভাল খেলা চাই।"

বলাইদা নিশ্চয়ই ইস্টবেঙ্গলের কিটুর কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি মাঠে খেলব কী, রাত্রিতে খাটে শুয়ে মনে মনে খেলছিলুম তন্দ্রার ঘোরে। বোধহয় একটা শটও করেছিলুম। সামনে বল থাকলে নির্ঘাত 'গোল' হত।

এতকাল পরে আমার মনের মতো একটা কথা বলেছেন পশ্চিম জার্মানির বিজ্ঞ কোচ হেলমুট শ্যোয়েন। বলেছেন এবারকার বিশ্বকাপ ফুটবলে পশ্চিম জার্মানি ও পোল্যান্ডের উদ্বোধনী খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হবার পর। গতবারের বিজয়ী দারুণ শক্তিশালী পশ্চিম জার্মানি তো ও-ম্যাচে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। তাই বলেছেন, একটি মাত্র খেলা দিয়ে বিশ্বকাপের উদ্বোধন করা ঠিক নয়। স্টেডিয়ামের দর্শকদের তো বটেই, সারা পৃথিবীর নজর থাকে ওই খেলাটির উপরে। খেলোয়াড়দের মনের উপর এত চাপ থাকে যে, কিছুতেই তারা স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে না।

কথাটা খুবই সত্যি। আবার এ কথাও সত্যি যে, বড় খেলার ভূমিকা নিয়েই বড় খেলোয়াড়ের গুণের বিচার। যাই হোক, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আমার প্রথম খেলায় অন্তত সংবাদপত্রের পাতায় প্রশংসা পেয়েছিলুম। দর্শক সমর্থকদের মুখেও। গোল করতে পারিনি। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছিল। আজ বলছি, খেলার আগে অত চিন্তা, অত মানসিক চাপ ছিল, কিন্তু মাঠে নামার পর সবই যেন কোথায় চলে গেল। তখন প্রাণপণ করে ভাল খেলার সংকল্পে মেতে উঠেছিলুম।

ওই বছর শীল্ড জয়ের কথা আগেই লিখেছি। আমরা লীগ চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলুম। ওইবার নিয়ে টানা তিনবার।

ডুরান্ডে কিন্তু প্রথম খেলাতেই মোহনবাগান হেরে গেল আম্বালা হিরোজের কাছে ০—২ গোলে। মেলবোর্ন অলিম্পিক থেকে বদরু ব্যানার্জি, কেষ্ট পাল ফিরে আসার পর মোহনবাগানের ওই পরাজয় একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। আম্বালা হিরোজ যে ভাল টীম ছিল তা নয়, তবে কড়া টীম ছিল। ওরা প্রথম একটি গোল করে বসল। আমরা গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণের উপর আক্রমণ চালালুম। দশজনই প্রায় উপরে উঠে পড়েছিলুম। তার ফলে ডিফেন্সে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল সেই ফাঁক দিয়েই আম্বালা আর একটি গোল করে বসল। ডুরান্ডে ওটি ছিল আমার প্রথম খেলা। গোল পেলুম না, পেলুম না দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার সুযোগ। যেন পত্রপাঠ বিদায়ের মতো।

ওই যে বেশি খেয়ে বিপদে পড়ার কথা আগে লিখেছিলুম না, এবার সেই কথা শোনো। ওই বছর রোভার্স কাপের ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কছে আমরা হেরে গিয়েছিলুম ১—৩ গোলে। অথচ আগের বছর শক্তিশালী মহমেডানকে ফাইনালে হারিয়েই আমরা প্রথম রোভার্স কাপ জিতেছিলুম। ছাপ্পান্নর মহমেডান টিম তত শক্তিশালী ছিল না। তবু কেন হেরেছিলুম? আমি বলব, বোম্বাইয়ের ভেলপুরিই আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল। আগের দিন বিকেলে চৌপট্টিতে বেড়াতে গিয়ে আমরা ভেলপুরি খেয়েছিলুম। কিন্তু ভেলপুরি মুখরোচক হলে কী হবে। কোন কিছুই বেশি খাওয়া ভাল নয়। বেশি খাবার কুফল হাতেনাতেই পেয়েছিলুম। মুখে কিন্তু কেউই আমরা সে-কথা বলিনি, যদি দল থেকে বাদ পড়ে যাই। ফাইনাল খেলার সময় একেবারেই দম পাচ্ছিলুম না। একটু দৌড়েই হাঁপিয়ে উঠছিলুম। তবু ১১ মিনিটের সময় আমি একটি গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে রেখেছিলুম। তারপর মহমেডান তিনটি গোল করল আমাদের ছন্নছাড়া অবস্থার মধ্যে। একটা বড় শিক্ষা হল। আর কোনদিনই বে-হিসেবি খাবারের শিকার হইনি।

ছাপ্পান্নর মরসুমে আমার সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে একটি বলার মতো ঘটনা, জাতীয় ফুটবলে রেকর্ড গোলের ভাগীদার হওয়া। ত্রিবান্দ্রমে ওই বছর কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ১২—০ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করে। জাতীয় ফুটবলের খেলায় এখনও পর্যন্ত ওটিই বেশি গোলের রেকর্ড। পি কে তিনটি, কেষ্ট পাল হ্যাটট্রিক সমেত তিনটি, বদরু দুটি, পদ্ম মিত্র ও কানাইয়ান একটি করে গোল পায়। আমি করি দুটি গোল। সেমিফাইনালে বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে আমাকে না খেলানো নিয়ে বেশ একটু গুঞ্জন ওঠে। হয়তো বোম্বাইয়ের কাছে বাংলা ১—০ গোলে হেরে যাওয়ায়।

শুনেছি নিশ্চয়ই ছাপ্পান্নয় মেলবোর্ন অলিম্পিকেও আমি খেলিনি। কোচিং ক্যাম্পে কর্তাব্যক্তিদের খুশি করা সত্ত্বেও কেন যে তাঁরা আমার খেলোয়াড়জীবনের উঠতির সময়ে একটা বড় দাগা দিলেন, সে-কথা লিখব পরের সংখ্যায়। (ক্রমশ)

সতেরোই আগস্ট
১৯৭৮

ভাই অমিতায়ু,

দাদা মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভীষন ভালো রেজাল্ট করেছে। তাই পরশু বিকেলে আমাদের বাড়ীতে হৈ-চৈ হবে, খাওয়া-দাওয়া হবে। তুমি অনির্বানকে আর রাজাকে নিয়ে নিশ্চয়ই আসবে। দাদা নিজেই তোমাদের বাড়ী যেতো কিন্তু এখন ও একটা কেউ-কেটা ভাব দেখায়। ও উচ্চমাধ্যমিক পড়বে, বিজ্ঞান ~~বিভাগে~~ বিভাগে। খোকনমামার চিঠি নিয়ে ~~অনেক~~ কতো যে অধ্যাপকদের বাড়ী ও যাচ্ছে তা আমি বলতে পারবো না। বড় হয়ে দাদা 'পদার্থবিদ্যা' সম্বন্ধে অনেক — অ-নেক লেখাপড়া নাকি শিখবে, তাই খোকনমামার সব অধ্যাপক বন্ধুরা দাদাকে ডঃ অলক চক্রবর্তীর লেখা 'পদার্থবিদ্যা' বইটা অবশ্যই পড়তে বলেছেন, সঙ্গে 'ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা' এবং উনারই ডঃ জীবন্তনারায়ন নাগের সঙ্গে লেখা পদার্থবিদ্যার নানা ধরনের বুদ্ধির অংক ও সমস্যার সমাধান 'পদার্থবিদ্যা উদাহরনিকা' পড়তে। মাঝে মাঝে দাদা অবশ্য বলছে ইংরাজীতে পড়বে, খোকনমামা অবশ্য বলেছে 'নো চিন্তা' উনারই ইংরাজী ভাষায় বই আছে 'A Text-book on Physics', তুমি ~~বোধ~~ বোধ হয় দাদার বন্ধু তুলুদাকে চেনো, ~~তিনি~~ সে আবার 'জীববিজ্ঞান' পড়ছে। সে ডাক্তার হবে, এই অবশ্য সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। সে মুখোপাধ্যায়, মোদ্দা, মোদ্দা, মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'জীববিজ্ঞান' - কিনে আবার দাদাকে দেখাতে এসেছিল,

ভালো কথা, তোমার সেজদা আর বড়দিও তো পাশ করেছে বলে শুনেছি। ওরা কি করছে? পরশু এসো কিন্তু।

— ইতি নীলাঞ্জন

পুঃ - বইগুলো সব 'দি নিউ বুক স্টল' ~~[illegible]~~ কোলকাতা ৯ ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

মহম্মদ আলির ঘুষি কুন্তক

বৌদির মত হল এই যে, বাংলা ভাষাটাই খুব বিশ্রীরকম হিজিবিজি হয়ে আছে।

ধরো না কেন, যদি একটা ই একটা উ একটা ন একটা স থাকত—

আর, একটা র ?

হ্যাঁ, একটা র, তাহলে বানান ভুলের কোনো সমস্যাই থাকত না আর।

মায়ের সঙ্গে নন্তুর বেশি বনে না বটে, কিন্তু এই কথায় দেখা গেল তারও খুব ফুর্তি। বলল : বোঝাও তো মা কাকুকে।

আমি বলি : টুম্পি কার দলে ?

টুম্পিকে কি আর জিজ্ঞেস করতে হবে ? ও তো তোমার দলে হয়েই আছে। কিন্তু দলাদলির কথা নয়। তুমি বলো কথাটা সত্যি কি না।

না, পুরো সত্যি নয়। কী করে হবে সত্যি ? এই যে ধরো সেদিন বললাম গ্রন্থ লিখতে গ্রন্থ লিখে বসে অনেকে, এর মধ্যে কি ই উ ন স-এর কোনো ব্যাপার আছে, বলো ?

ওরকম দুটো একটা—

দুটো একটা কেন হবে, অনেকটাই, অনেকটাই।

আসলে কী জানো মা, বানান যদি সোজা হয়ে যায় তাহলে কাকুর মাথায় বজ্রাঘাত! ই উ ন স হচ্ছে কাকুর একমাত্র অবলম্বন। ওই যে কী বলে না, অন্ধের ষষ্ঠি।

কী ষ্ঠি ?

অন্ধের ষষ্ঠি। এমন ভাব করছ যেন শোনোনি কখনো কথাটা।

শুনব না কেন ? সেই কথাই তো বলছিলাম। বলছিলাম যে ই উ ন স ছাড়াও আমার আরও ষষ্টি আছে। একটা লাঠিতে কি কাজ চলে ?

টুম্পি বলল : কী যেন একটা বলছে কাকু। বুঝতে পারছি না ঠিক।

বলছি যে, স্ত আর স্থ নিয়েই যে গোলমাল শুধু, তা তো নয়। ষ্ট আর ষ্ঠ-কেও সামলানো শক্ত। ওই-যে ষষ্ঠি বলল নন্তু, আসলে ওটা ষষ্টি।

অ্যাঁ ? ষষ্টি ?

আজ্ঞে।

ষষ্টি বললে লাঠি হয় ? বলো কী ? ওতে লাঠির আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না মোটে।

তা না গেলে আমি কী করব ? প্রকাণ্ড এক ঘুষি দিলে যে মুঠোর আওয়াজ হয়—

এ কী, হাত বাড়াচ্ছ কেন, মারবে না কি ?

না, না, মারব না। ঘুষিটা দেখালাম শুধু। মুষ্টি।

কী ?

মুষ্টি। মুষ্ট্যাঘাত। শুনিসনি ?

মুষ্টি ? ওটা মুষ্ঠি নয় ? বলো কী ? ঠিক জানো তুমি ?

বৌদিরও চোখ কপালে উঠল : ঠাট্টা করছ, না ?

আরে ঠাট্টা কেন করব ? ভিখিরি এলে তোমরা যে একমুঠো চাল দাও—

টুম্পি বলে উঠল পিছন থেকে : দেয় না ছাই !

আচ্ছা, যদি ধরো দেয় কেউ, কী বলে তাকে ? মুষ্টিভিক্ষা। অল্প খানিকটা' বোঝাতে আমরা কী বলি ? মুষ্টিমেয়।

যাব্বাবা ! আমি তো চিরকাল মুষ্ঠিভিক্ষাই দিয়ে এলাম।

ফলে দেখো, ই উ ন স দিয়েই সামলানো যাচ্ছে না ব্যাপারটা। আরো কত গোলমাল হতে পারে। জামাইষষ্ঠী যদি বলো তো ঠিক আছে, ষষ্ঠ থেকে ষষ্ঠী, অষ্টম থেকে অষ্টমী। কিন্তু ষষ্টি ?

সেটা আবার কী ?

সেটা হল ছয়ের দশগুণ। ষাট। ষষ্টিবর্ষব্যাপী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা।

ষাট বছর বললেই চুকে যায়।

সে তো ঠিকই। কিন্তু যদি কখনো কারো ইচ্ছে করে, না হয় ঝুলিয়েই দিল লাল শালুতে ষষ্টিবর্ষের বিজ্ঞাপন। নিকৃষ্ট, কিন্তু শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ। ষ্ঠ প্রত্যয় দিয়ে যেমন স্থ হয়, তেমনি ষ্ট। ন্যস্ত গ্রস্ত ব্যস্ত যেমন, তেমনি নষ্ট সৃষ্ট দষ্ট।

দষ্টটা কী জিনিস ?

যাকে কামড়ানো হয়েছে, দংশন করা হয়েছে। সর্পদষ্ট শুনিসনি ? অন্যদিকে ধর, অবস্থা গৃহস্থ সুস্থ, তেমনি প্রতিষ্ঠা গোষ্ঠ সুষ্ঠু। এগুলির মধ্যে সেই থাকাটা লুকিয়ে আছে। স্থ।

তাহলে বলিষ্ঠ মানে কী কাকু ? বলের মধ্যে, মানে শক্তির মধ্যে যে আছে, সে ?

আরে আরে তা নয়। সব ষ্ঠ-ই স্থ থেকে হয়নি। 'সবচেয়ে বেশি' বোঝাবার জন্য একটা চিহ্ন আছে, একটা প্রত্যয় আছে। তাকে বলে, ইষ্ঠ। যেমন ধর শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বলিষ্ঠ পাপিষ্ঠ গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠ। শুনেছিস তো এসব ?

শুনিনি আবার। ল সা গু আর গ সা গু শুরু হয়ে গেছে না আমাদের ! কাকু, অঙ্কটাই হচ্ছে সবচেয়ে পাপিষ্ঠ।

সবচেয়ে আর না বললেও পারিস। পাপিষ্ঠ বললেই তো সবচেয়ে পাপী বোঝাচ্ছে। কিন্তু নন্তুবাবু, আপনি অনেকক্ষণ চুপ করে আছেন কেন ?

আমি একটা কথা ভাবছি।

কী ভাবছেন ?

ভাবছি যে, ক্যাসিয়াস ক্লে, মানে মহম্মদ আলি, তার ঘুষিটাকেও কি মুষ্টি বললে চলবে ? সেটাও কি মুষ্ঠি নয় ?

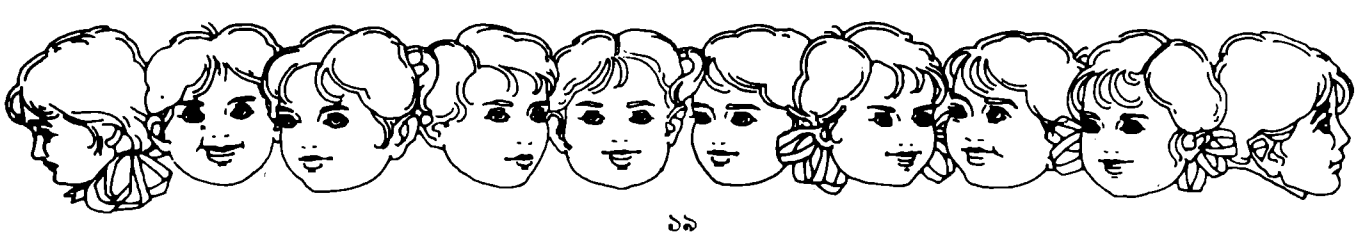

মাধ্যমিকে ফার্স্ট গৌতমের সঙ্গে

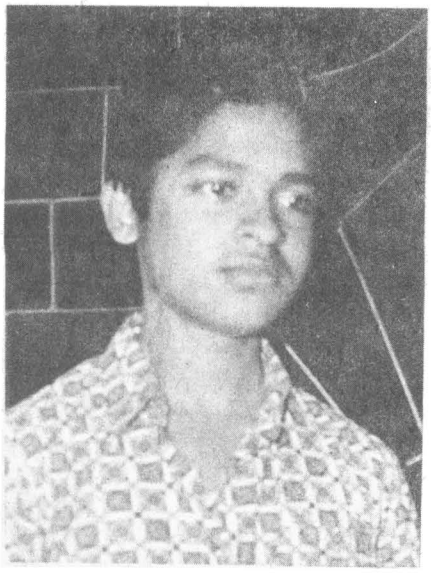

কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে নগেন্দ্রনগরে গৌতমদের বাড়ি। গৌতম মণ্ডল এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। তেহট্ট থানার চাঁদেরঘাট গ্রামে ওদের নিজেদের বাড়ি। বাবা শ্রী গোপাল মণ্ডল কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের অঙ্ক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। গৌতমের প্রাথমিক শিক্ষা মেরি ইমাকুলেট স্কুলে। তারপর থেকেই সে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। বরাবরই সে ক্লাসের ফার্স্ট বয়। টেস্ট পরীক্ষার ফলের সঙ্গে গৌতমের নম্বরের ফারাক মাত্র এক নম্বরের। টেস্টে পেয়েছিল ৮৮১, ফাইন্যালে ৮৮২।

আমরা ওদের বাড়িতে পৌঁছবার একটু পরেই গৌতম বাড়ি ফিরল। ওকে তখন খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বুঝলাম, খেলে ফিরছে। মাসিক আনন্দমেলা থেকে এসেছি শুনে চোখমুখ ঝলমল করে উঠল। ও বলল, "অন্যান্য কাগজ থেকে অনেকেই এসেছেন, তার জন্যে আনন্দ হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু আজকের আনন্দ সবচেয়ে বেশি। **মাসিক আনন্দমেলা আমার সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা।**"

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাকে সুযোগ না দিয়ে গৌতম বলল, "**মাসিক আনন্দমেলা আমি নিয়মিত পড়ি। আর একটা কথা না-বললে অন্যায় হবে ; সেটা হল, মাধ্যমিকে আমার প্রথম হওয়ার পিছনে এই পত্রিকাটির দান অনেকখানি। মাসিক আনন্দমেলা আমার দারুণ উপকার করেছে।**"

"কী ভাবে?"

"বিভিন্ন স্কুলের ফার্স্ট বয়রা কী ভাবে তৈরি হচ্ছে—মাসিক আনন্দমেলা পড়ে জানতে পেরেছি। এমনিতে তো ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ নেই, ওদের কথা জানার সুযোগ করে দিয়েছে এই পত্রিকাটি। আর, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের উপদেশ মেনে চললে যে কী ফল দেয়, তার প্রমাণ পেয়েছি হাতে-হাতে। সবচেয়ে মজার হল 'মজার পড়া'। বানান শেখা খুব নীরস ব্যাপার, কিন্তু ওই লেখাটা পড়লে তা একবারও মনে হয় না। আসলে কোনটার কথা আলাদা করে বলব? সব লেখাই কোনো-না-কোনোভাবে আমার উপকার করেছে।"

"কতক্ষণ পড়তে তুমি?"

"আমি সারা বছরই স্কুলের সময় নিয়ে ঘন্টা আটেক পড়তাম। পরীক্ষার আগে বেশি পড়ার ব্যাপার নেই। সারাক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকা আমার একদম পছন্দ হয় না।"

"ভাল ফল করার জন্যে তুমি কী ভাবে নিজেকে তৈরি করেছ?"

"প্রতিটি বিষয়ের জন্যেই একটা করে বেস বুক আমার ছিল। তার সঙ্গে যত বেশি সম্ভব রেফারেন্স বই পড়তাম। ইতিহাস, ভূগোল, জড়বিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞানে যত বেশি বই পড়া যায় ততই ভাল। লেখাটা বড় বেশি প্রয়োজন। আমি পড়ার মোট সময়ের ৮০ ভাগ দিতাম লেখায়। বইয়ের সাহায্যে এক-একটা প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতাম। তারপর সেটা স্কুলের শিক্ষক বা বাবার কাছ থেকে সংশোধন করিয়ে নিতাম। নিজে খেটে একটা প্রশ্ন লিখলে সেটা আর সহজে ভুল হয় না।"

"দুটো বিজ্ঞান আর অঙ্ক—এই তিনটেতেই তুমি প্রায় ফুল মার্কস পেয়েছ। এই বিষয় তিনটি তুমি কি কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করেছ?"

"এই বিষয়গুলির জন্যে স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়াও আমি আগেকার উচ্চ-মাধ্যমিকের বইগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি। আমার দিদি কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়েন। তিনিও আমাকে সাহায্য করেছেন। পরীক্ষার আগেই দুবছরের টেস্ট পেপার্স সম্পূর্ণ সমাধান করেছি। অঙ্ক দেখিয়ে দিয়েছেন আমার বাবা। আমাদের স্কুলে পাঠ্য ছিল কেশবচন্দ্র নাগের বই। এ ছাড়া ইন্টারমিডিয়েটের পাঠ্য কেশবচন্দ্র নাগের বই এবং হল্ স্টিভেনস্ অ্যান্ড সেনের বইও আমার খুব কাজে লেগেছে। আমাদের বইয়ের সমস্ত একসট্রা করেছি।"

"ইংরেজি তুমি কী ভাবে পড়েছ?"

"আমি বইয়ের সব গল্প আর কবিতা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। সব প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমি এর জন্যে কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের মূল ইংরেজি রচনা পড়েছিলাম। ভাল ইংরেজি শেখার ব্যাপারে ওই লেখাগুলিও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে।"

শুধু পড়াশুনোতেই নয়, খেলাতেও গৌতম সমান আগ্রহী। ফুটবল, ক্রিকেট দুটোই খেলে ও। তবে টেবিল টেনিস ওর সবচাইতে প্রিয় খেলা।

"তুমি কোন দলের সাপোর্টার?"

গৌতম হেসে বলল, "অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু এই প্রশ্নটার উত্তর আমি কোথাও দিইনি। আমার বন্ধুরা রেগে গিয়ে বলেছে, কী রে, তুই তো মোহনবাগানের অন্ধ সাপোর্টার, কিন্তু কাউকে বলিস না কেন?"

ফেরার সময় গৌতম বিভিন্ন আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পাওয়া প্রাইজগুলো দেখাল। নদীয়া জেলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ও প্রথম হয়েছিল। শরৎ শতবার্ষিকীতে জেলা কমিটি আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় গৌতম প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। বিজ্ঞান ওর প্রিয় বিষয়, তাই ও বিজ্ঞান নিয়েই পড়বে। ওর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

কাবুল

জয়ন্ত দাস

বিদেশ থেকে ফিরে এল
পাড়ার দাদা হাবুল,
এসেই বলে, "কখনো কি
গেছিস তোরা কাবুল?
জায়গাটা খুব মজার বটে,
একটি কিন্তু ট্রাবুল,
কোনো জিনিস কিনতে গেলেই
দাম লাগে তার ডাবুল।"

বিশ্বকাপ ফুটবল / সচিত্র ধারাবিবরণী

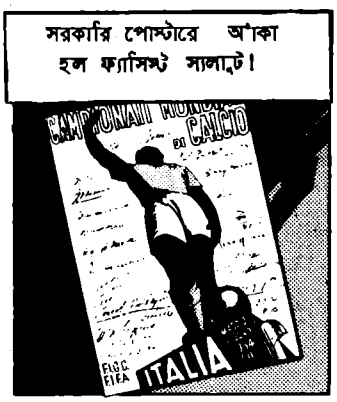

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

আমার টমেটো

টমেটো আমার ভীষণ ভাল লাগে। লাল টুকটুকে টমেটো কুচিয়ে পেঁয়াজ আর লংকা দিয়ে খেতে দারুণ লাগে। দুবেলা ভাত খাবার সময় না পেলেই নয়। টমেটো আমার চাই-ই চাই।

এ বছর আলু চাষের সময় আমি হাট থেকে গোটা পঞ্চাশেক টমেটোর চারা কিনে এনেছিলাম। আলু-জমিতে বসিয়ে জল ঢেলেছি রোজ। গাছ-গুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠল। টমেটো হল। লাল টুকটুকে টমেটো রোজ তুলে নিয়ে যেতে লাগলাম। আশ মিটিয়ে খেতে লাগলাম। বাবা বলেন, টমেটো হচ্ছে ভারতের আপেল।

এখনও সেই টমেটো খাচ্ছি। গাছে আবার নতুন করে ছোট ছোট টমেটো ধরছে। ভারী মজা। কিন্তু ইদানীং একটা মজার ঘটনা ঘটছে।

খুলেই বলি। আগে, মানে সারা শীতেই, অক্ষত টমেটো তুলে নিয়ে গেছি। কিন্তু ফাল্গুনের শেষ থেকেই দেখছি কে বা কারা যেন লাল টমেটোগুলোকে ঠুকরিয়ে খেয়ে যাচ্ছে। বিকেলে মাঠে গিয়ে দেখি সামান্য-সামান্য লাল রঙ ধরেছে। মনে করি, কাল সকালে তুলে নিয়ে যাব। ওমা! সকালে মাঠে গিয়ে দেখি কে বা কারা ঠুকরিয়ে-ঠুকরিয়ে অর্ধেকটা খেয়ে রেখে গেছে। আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! মহা ভাবনায় পড়লাম। এর একটা সুরাহা চাই।

প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম, মা-বাবাও বলতেন ইঁদুরে খেয়ে যাচ্ছে। অথচ সারা মাঠে কোথাও ইঁদুরের গর্ত পাই না। তাহলে ব্যাপারটা কী।

একদিন সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠেই ছুটলাম মাঠে, মানে টমেটো বাগানে। যেতে দেখি, কয়েকটা বুলবুলি পাখি বেড়ার ধারে বসে আছে। আমি আর না এগিয়ে বসে পড়লাম। তারপর যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু স্থির। দেখি, বুলবুলিগুলো মনের সুখে লাল টমেটোগুলোয় ঠোকর দিচ্ছে। আসল রহস্য ধরা পড়ল তখন।

কঙ্কাবতী সরকার (বয়স-১৪)

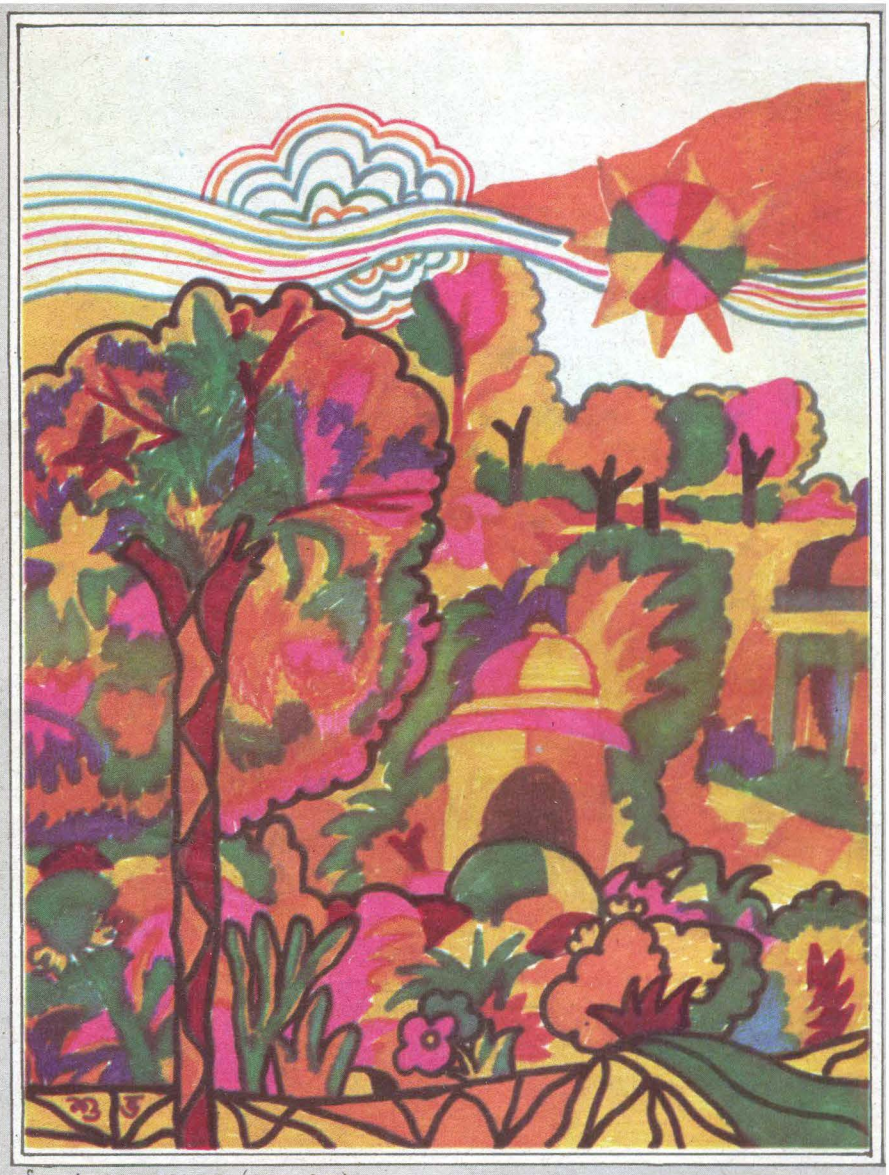

ছবি এঁকেছে **শুভ ঘোষ** (বয়স—১৪)

চিঠি

আমরা সান্তালডিতে থাকি। ছোট্ট এই শহরটাকে আমি খুব ভালবাসি। এখানে খেলার জন্য অনেক বড় বড় মাঠ আছে। আর প্রত্যেক পাড়াতে একটা করে পার্ক আছে। আমি ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতে খুব ভালবাসি। আর ভালবাসি 'মাসিক আনন্দমেলা' পড়তে। টারজান, টিনটিন আমার খুব ভাল লাগে। আমার মাও আমার মতো আনন্দমেলা পড়তে ভালবাসেন। আমার কাকামণিও প্রত্যেক মাসে আনন্দমেলা পড়েন।

ভাস্কর দত্ত (বয়স—৮)

আমি মাসিক আনন্দমেলার নিয়মিত গ্রাহক। আনন্দমেলা আমার খুব ভাল লাগে। আনন্দ-মেলার সঙ্গে আমার নামের মিল আছে বলে আরও ভাল লাগে। আমার নাম আনন্দ।

আনন্দময় মুখোপাধ্যায় (বয়স—১১)

লোড-শেডিং

লোড-শেডিং মানেই অন্ধকার
অন্ধকার আর স্টেশন একাকার
লোড-শেডিং মানেই কালো
কালো কি ভালো?

সুদেষ্ণা বিশ্বাস (বয়স—৯)

অ্যাথেন্স

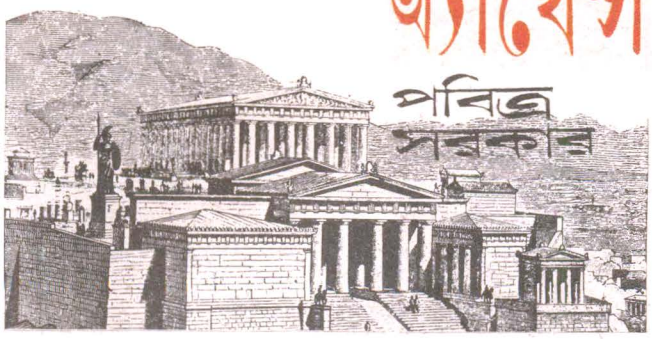

রোমের তুলনায় অ্যাথেন্স দেখা খুব সোজা। সেখানে দেখবার জিনিস তো হাতে গোনা। আর তুমি যদি আমাদের পাড়ার সান্ত্বনামাসির মতো না হও, তাহলে অ্যাথেন্স দু-তিন দিনে তুমি বেশ ভাল করে দেখে বহাল তবিয়তে অন্য জায়গায় ঢুঁ মারতে পারবে।

যে-কোনো দেবস্থানের পাণ্ডারা প্রতিদিন সকালে ভগবানের কাছে একজন আদর্শ যাত্রীর জন্যে প্রার্থনা জানায়। বলে, প্রভু, এমন একজন যাত্রীর যেন দেখা পাই, যে ইংরেজি জানবে না, দেবদ্বিজে অবিশ্বাস করবে না, যার অঢেল টাকা থাকবে, আর আমরা ইচ্ছেমতো যার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারব। সান্ত্বনা-মাসি হচ্ছেন সেইরকম একজন আদর্শ যাত্রী। তিনি পৌঁছুনোমাত্র শহরের পাণ্ডা আর গাইডদের মধ্যে আনন্দের সোরগোল পড়ে যায়। পাণ্ডা অবিশ্যি সব জায়গাতেই তাঁর বাঁধা, কিন্তু আশেপাশে অন্য পাণ্ডাদের ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাঁদেরও হাতে একটাকা-দুটাকা বকশিশ গুঁজে দেন, বলেন, আহা, বেচারীরা আশা করে ছুটে এসেছিল তো? আমার পাণ্ডা নয় তো কী হয়েছে!

তারপর শুরু হয় তাঁর নিজের পাণ্ডার সঙ্গে পরিভ্রমণ। সঙ্গীদের পক্ষে সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। পাণ্ডা প্রতি রাস্তায় তাঁকে অন্ততপক্ষে গোটাবিশেক ঠাকুর দেখাবে, সেখানে পুজো আর দক্ষিণা দেওয়াবে। মাঠের মাঝখানে পাথরে একটু গর্তমতন দেখিয়ে বলবে, এখানে অমুক দেবতা পা রেখেছিলেন—পুজো দিন, দক্ষিণা দিন। এখানে তমুক দেবতার মাসতুতো বোনের শ্বশুর-বাড়ি, এখানে পুজো দিন, দক্ষিণা দিন। ভক্তিগদগদ মুখে, বিনা-বাক্যব্যয়ে সান্ত্বনামাসি তাই করবেন। ফলে সাতদিনের জন্যে কোনো তীর্থস্থানে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেড়মাস থেকে আসবেন, আর তাঁর পাণ্ডার বাড়িতে রোজ মহোৎসব চলবে।

আমি সান্ত্বনামাসি যেমন নই, আবার তেমনি পেশাদার টুরিস্টও নই। অ্যাথেন্স আমার স্বপ্নের শহর। ছেলেবেলায় আই এ ক্লাশে বিউরির লেখা গ্রীসের ইতিহাস পড়তে পড়তে কতবার ভূমধ্যসাগরের নীলিমার বুকে করমর্দনের-জন্যে-বাড়িয়ে-দেওয়া পাঞ্জার মতো এই উপদ্বীপের বুকে বেড়িয়ে গেছি কল্পনায়। ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার সূতিকাগার ও অন্যতম ঐশ্বর্যময় বিকাশ এখানে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু জ্ঞানী, মহাকবি ও নাট্য-কারের দেশ। আজ যখন আসার সুযোগ পেয়েছি—শুধু একা নয়, সপরিবারে—তখন আমার স্বপ্নপূরণে যেন ফাঁকি না থাকে।

ওলিম্পিয়া এয়ারওয়েজের সাতশো-সাত প্লেনে নামব অ্যাথেন্সে। তাকিয়ে দেখি, চতুর্দিকেই সমুদ্র। আর অত নীল সমুদ্র আমি এক হাওয়াইয়ে ছাড়া আর-কোথাও দেখিনি। দেখতে দেখতে নীল সমুদ্রের লক্ষ-লক্ষ ঢেউ বিকেলের সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠল, আর প্লেনও সমুদ্রকে ফাঁকি দিয়ে অ্যাথেন্সের এয়ারপোর্টে এসে নেমে পড়ল।

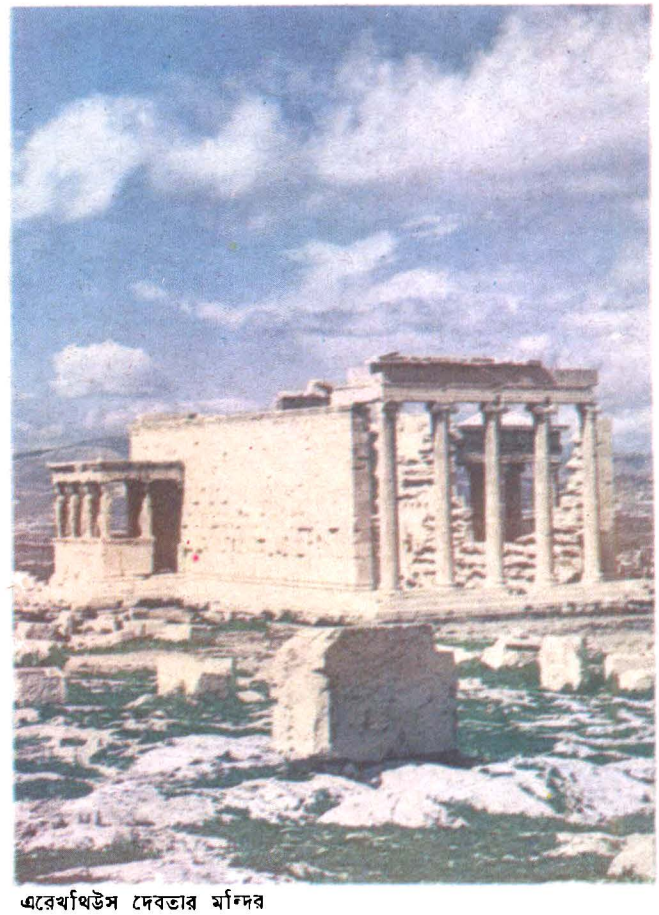
এরেখথিউস দেবতার মন্দির

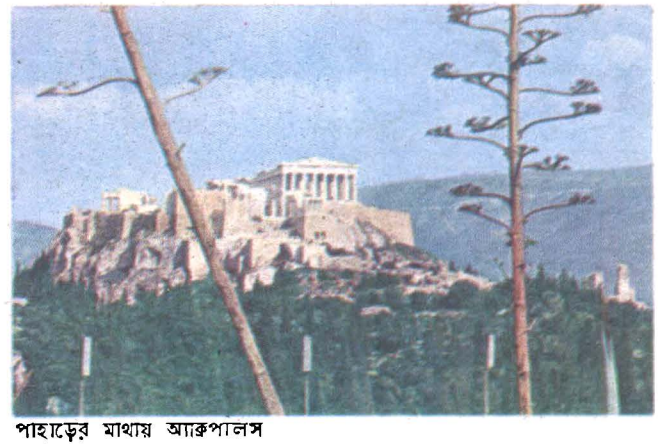
পাহাড়ের মাথায় অ্যাক্রপোলস

দেবী অ্যাথেনার মন্দির পার্থেনন

সব শহরের মতোই, বিমানবন্দর থেকে শহর এখানেও বেশ খানিকটা দূরে। মাঠ আর ফসলের খেত পেরিয়ে যখন ঘরবাড়ি শুরু হল, তখন বোঝা গেল, এ-শহর পশ্চিমের অন্যান্য শহরের তুলনায় একটু গরিব। যাবার পথে কিছুদূর একতলা বাড়িই বেশির ভাগ, দোতলা কদাচিৎ। কেন জানি না, শহরে ঢোকার আগে আয়না, ঘরে লাগানোর নানাধরনের ইলেকট্রিক লাইট ও আলোর ঝাড়—এইসব দোকানই বেশি চোখে পড়ে। সরু শহরের রাস্তা ধরে এগুচ্ছি, একটু দমে গেছে মনটা, এমন সময় বাসটা বাঁক ফিরল।

হঠাৎ সামনে পশ্চিমের আকাশ খুলে গেল অনেকটা, আর সেই আকাশের কোলে, উঁচু পাহাড়ের মাথায়, শহরের মাথায় রাজমুকুটের মতো দেখা দিল অ্যাক্রপলিস। পাহাড়ের উপরে বিরাট-বিরাট থামওয়ালা দেবী এথেনা আর দেবরাজ জিউসের মন্দির। এত মহৎ, এত সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি মানুষের আর বেশি নেই। আড়াই হাজার বছর ধরে যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল, এইভাবে হঠাৎ আবিষ্কৃত হবে বলে।

সেই মুহূর্তে কিন্তু অ্যাক্রপলিসকে পাশ কাটিয়ে গেলুম। এয়ারপোর্টের বাস গিয়ে থামল সিনট্যাগমা বা কনস্টিটুশন স্কোয়ারে। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে হোটেলে। হোটেলটা ওমোনিয়া স্কোয়ার এলাকায়, শহরের উত্তর-পশ্চিমে। নাম হোটেল এপিদাউরোস, কিন্তু রাস্তার নামটাই বিদঘুটে, অক্ষর ধরে ঠিক-ঠিক উচ্চারণ করলে কোমোন্দোরো স্ট্রীট দাঁড়ায়।

তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, কাজেই আর বেরুনো গেল না। আমার স্ত্রী বললেন, অ্যাক্রপলিস দিয়ে শুরু করব বাপু কাল সকালে। সঙ্গে পৌনে দু বছর বয়সের আরেকটি ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাঁরও সম্মতি মনে হল সেই দিকেই।

এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার
বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের সঙ্গে
EXHAUSTIVE QUESTIONS এ দেওয়া
প্রশ্নগুলি মিলিয়ে নিলে বোঝা যাবে
এ বইয়ের সার্থকতা কোথায় !

১৯৭৯ সালের পরীক্ষার্থীদের বই এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। দাম ১৫ টাকা। পুরো টাকা M.O. করলে রেজিস্ট্রী ডাকে বই পাঠানো হয়। অবশ্য বই ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই টাকা আসা চাই।

B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE, CALCUTTA-700 009

পরদিন সকালে ওমোনিয়া স্কোয়ারে ফোয়ারার জলের ঝাপটা খেয়ে বাস ধরলাম অ্যাক্রপলিসের। একটু দূরে নেমে হেঁটে উঠতে হল সেই পর্বতচূড়ায়, যার নামের অনুবাদ 'উচ্চ-নগরী'। মাটির সমতল থেকে ২৩০ ফুট উঁচু এই নগর। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অ্যাক্রপলিসের মন্দির-উপনিবেশের নির্মাণ শুরু হয়। একাধিকবার বাইরের শত্রুরা এসে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, বারবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে এই দেবভূমি। এখনই বা তার কী আছে—কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছাড়া তো আর কিছু নেই। কখনো সার-সার সিঁড়ি, কখনো ঢালু টানা-পথ, প্রপিলাইয়া দিয়ে উঠে যাও পাহাড়ের উপরে। উঠেই মনে হবে, কেউ যেন তরোয়ালের এক কোপে পাহাড়ের চুড়োটা কেটে খানিকটা সমতল মাঠের মতো বানিয়ে দিয়েছে। উঠতে গিয়েই ডানদিকে পড়বে ছোট্ট একটা মন্দির—'নিকে' বা 'জয়' দেবীর মন্দির। ওরা বলে ডানাকাটা জয়দেবীর মন্দির। ডানাকাটা, কেননা জয়দেবী তাহলে পালাতে পারবেন না, চিরস্থায়ীভাবে অ্যাথেন্সেই থাকবেন। তোমরা যারা ইতিহাস পড়েছ, তারা জানো, ডানা না থাকলেও জয়দেবী এ শহরের মায়া কাটিয়ে বহুবার উড়ে গেছেন নানা দেশে।

সে যাই হোক, তাঁর মন্দিরটি ভারী সুন্দর, পুরনো মন্দিরটি অবিশ্যি আর নেই, কিন্তু পুরনো পাথর আর স্তম্ভ দিয়েই এটি গত শতাব্দীতে নতুন করে তৈরি হয়েছে।

এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে এগুতে তোমার কষ্ট হবে। প্রপিলাইয়ার সিংহদ্বার পার হয়ে অসমতল পাথরে টাল খেতে-খেতে মাথা তুলে তাকাও—সামনে ডানদিকে দেবী অ্যাথেনার সেই জগদ্‌বিখ্যাত মন্দির, যার নাম পার্থেনন। এত বিশাল, মহান সুন্দর ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও নেই। জ্ঞানের দেবী অ্যাথেনা, তাঁর একটি চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ছিল এই মন্দিরে, হাতির দাঁতের তৈরি দেহ, পোশাক আর অলঙ্কার সোনায় তৈরি। কোথাও তার কোনো চিহ্ন নেই। শুধু দাঁড়িয়ে আছে ছাদের খিলানটি ধরে কতকগুলো অসামান্য থাম। ডোরিক রীতিতে তৈরি এই থাম-গুলোর মজা হল, দূর থেকে দেখলে মনে হয় তারা খাড়া উঠে গেছে, কিন্তু কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ে তাদের গা ঘেঁষে উপরের দিকে তাকালে দেখবে—তাদের পেটের কাছটা একটু ফুলে ওঠা, তাবিজের পেটের মতো।

কিছুই নেই, শুধুই বিপুল ধ্বংস। শত্রুতে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে, বন্ধুর বেশে এসে কেউ নিয়ে গেছে বিপুল স্থাপত্য সম্পদ। ইংরেজ লর্ড এলগিন বহু জিনিস নিয়ে গেছেন অ্যাক্রপলিস লুটে—এখন সে-সব ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 'এলগিন মারবেল্‌স' নামে শোভা পাচ্ছে। অনেক কিছু গেছে প্যারিস, ভেনিস, রোমের জাদুঘরে।

পার্থেননের উত্তর দিকে রয়েছে এরেখ্‌থিউম—এরেখথিউস দেবতার মন্দির। এরই দক্ষিণের বারান্দায় থামের বদলে ছাদটিকে বহন করে দাঁড়িয়ে আছে ছটি গ্রীক কুমারীর মূর্তি। মাথার বিপুল ভার তারা বহন করছে অতি স্বচ্ছন্দে—তাদের সৌন্দর্যের ক্ষতি করেছে শুধু মহাকাল, আর কিছু নয়।

বেরিয়ে এসে নমো নমো করে দুপুরের খাওয়া সারতে হল। প্রপিলাইয়ার ডানদিকেই একটি ছোট্ট পোস্ট-অফিস, সেখান থেকে ছবি-কার্ড পাঠিয়ে দিলুম কয়েকটি এদিকে-সেদিকে। তারপর দক্ষিণ দিকের গা ঘেঁষে নেমে গিয়ে পৌঁছলুম ডায়োনিসাসের থিয়েটারে।

এও তো ধ্বংসাবশেষ। ভাবতে পারো, সাতষট্টিটা সারি ছিল সীটের এতে, বসত ১৩০০০ লোকে? বসন্তের উৎসবে অভিনীত হত ইস্কাইলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপিদেসের ট্রাজেডি, অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডি? এখন তো মৃত এই মঞ্চ। আরেকটি

থিয়েটার আমরা দেখে এলুম—হেরোডেস অ্যাট্টকুসের ওডেয়ল—তবে সেটির সংস্কার করা হয়েছে, তাতে এখনও অভিনয় হয়। কিন্তু স্বয়ং নাটকের যিনি আদি দেবতা—সেই ডায়োনিসাসের থিয়েটারটি অবহেলিত পড়ে আছে।

পাহাড় ঘুরে আমরা গেলুম পুরনো 'অ্যাগোরা' বা সিটি স্কোয়ারে। চমৎকার মন্দির আছে একটি তার একধারে, নাম থেসেইয়ন—গ্রীক বিশ্বকর্মা হেফায়েস্টসের মন্দির। এর পুরনো ছাদটি এখনও অক্ষত আছে। অ্যাগোরার মধ্যেই ছিল প্রাচীন অ্যাথেন্সের বেচাকেনার জায়গা, তার বাজার। এখানেই গ্রীক-পুরুষেরা দিনরাত এসে আড্ডা দিত. তর্কে আর চেঁচামেচিতে জায়গাটা অস্থির করে তুলত।

অ্যাক্রপলিস দেখলে অ্যাথেন্সের চারভাগের তিনভাগই দেখা হয়ে যায়। একটু পুবে বিশাল চৌকোনা এক মাঠে দাঁড়িয়ে আছে দেবরাজ জিউসের মন্দিরের খান কয়েক থাম, তারই এক প্রান্তে রয়েছে একটি খিলান—এটি রোমান শাসক হাড্রিয়ান তৈরি করিয়েছিলেন। অ্যাগোরা থেকে বেরিয়ে, পুরনো ঘিঞ্জি শহর-এলাকা গলাকার মধ্য দিয়ে পৌঁছলুম সেখানে।

পথ হাঁটলেই তো খিদে পায়। ভাগ্য ভাল, এখানে শস্তার খাবার মন্দ নেই। পরোটার মধ্যে পাঁঠার মাংসের টুকরোর রোল, যাকে এরা বলে 'সুব্লাকি'—সে এক উত্তম জিনিস। তার সঙ্গে এক বোতল 'কোক' হলে সকলেরই তৃপ্তি। দলের মধ্যে কনিষ্ঠতমা যাত্রীটির আবার 'কোক' ছাড়া আর কিছুরই দরকার হয় না। দ্বিতীয়দিন আমরা অবিশ্যি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে হাঁটুর উপর রুমাল বিছিয়ে ভালমন্দ খেয়েছিলুম। খেয়েদেয়ে কফির অর্ডার দিয়েছি—সর্বনাশ, দেখি ঠাকুরঘরের গ্লাসের মতো খুদে-খুদে কাপে কালোমতো কী একটা দিয়ে গেল। চুমুক দিয়েছি কি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল—ভয়ংকর তীব্র ও কটু তার স্বাদ। হাঁহাঁ করে উঠতেই মালিক ছুটে এল। সমস্যাটি বুঝে একটু হাসল, তার পর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জানালে, অ্যাথেন্সে বিলিতি ধরনের কফি খেতে হলে 'নেসকাফে' চাইতে হয়, তাহলেই বড় কাপে দুধ চিনি দিয়ে ওরা বানিয়ে দেয়। নইলে এই জিনিস পাবে, গ্রীকরা এইই দিনে ত্রিশ-বত্রিশ কাপ উড়িয়ে দিচ্ছে। এই সব বলে সে আমাদের জিজ্ঞেস করলে, 'ইন্দিয়া?' আমরা বললুম, হ্যাঁ। সে বললে, ইন্ডিয়ার কোথায়? আমরা বলতেই সেই দশাসই গ্রীক 'কালকুত্তা' বলে আমাদের জড়িয়ে ধরে আর কী! কী বৃত্তান্ত? না সে যুদ্ধের সময় কলকাতায় ছিল, ভয়ানক খুশি হয়ে সে বললে 'আই দ্রিংক ইউ নেসকাফে!' অর্থাৎ, আমি তোমাদের, তোমাদের মতো কফি খাওয়াব! যাবার সময় আমরা বললুম 'এফারিস্টো'—ধন্যবাদ! সে বললে, 'কাম এগেইন'।

'সনে লুমিয়ের' অর্থাৎ আলো আর ধ্বনিযোগে রাত্রে অ্যাক্রপলিস দেখা এক মনোরম অভিজ্ঞতা। ফরাসি সরকারের উপহার এটি। টিকিট কেটে 'প্নিক্স' পাহাড়ে গিয়ে বসতে হয়। এক মুহূর্তে পেরিক্লিসের সৈন্যবাহিনীর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে আমরা মহৈশ্বর্যময় ইতিহাসের বাসিন্দা হয়ে গেলুম যেন। চোখের উপর দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়।

অ্যাথেন্স আমার আরেক কারণে মনে থাকবে। সাধারণত আমার কুড়িয়ে পাওয়ার ভাগ্য খুব খারাপ, সারা জীবনে আমি গোটা দেড়েক টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি কি না সন্দেহ। এক অ্যাথেন্সেই দুবার আমি পেলুম দুটি পঞ্চাশ দ্রাখমার নোট। অ্যাক্রপলিসের পায়ের তলায় একটি, সিনট্যাগমার উল্টোদিকে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের ধারের ফুটপাথে আরেকটি। ভাবলাম, চমৎকার হল, আরো দুবেলা 'সুবলাকি' আর কোক খাওয়া যাবে সপরিবারে। প্রায় তিরিশ টাকা তো। কম নয়।

সহজে ইংরেজি

নিজের নিজের কথা

এতদিনে চামেলিদের বাড়ির সকলের সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের-নিজের কথা গুছিয়ে বলে তাহলে ওদের বিষয়ে জানতে আমাদের আরও সুবিধে হয়।

প্রথমে শোনা যাক চামেলি কী বলছে।

I am a girl.
My name is Chameli.
My father's name is Mr. Ashok Roy.
Mrs. Lila Roy is my mother.
I love Araballi.

তারপর একে-একে অন্যেরা:

I am not a girl. I am a boy.
My name is Chambal.
Chameli is my sister.
I am her brother.
I play football.
I hate arithmetic.

I am Mrs. Roy.
My first name is Lila.
My husband's name is Ashok.
I have a son and a daughter.
My son's name is Chambal and my daughter's name is Chameli.

My name is Ashok Roy.
I am a doctor.
I treat patients.
I try to make them well.

I am Araballi.
I am brown.
I love mice.
I also love fish.

এবারে তোমরা কিছু করবে না? যে যার নিজের কথা ওই রকম ধাঁচের ছোট-ছোট বাক্য রচনা করে লেখ। তারপর নিজের-নিজের বাবা-মা, ভাই-বোনদের দিয়ে লেখাও। প্রত্যেকে এইভাবে নিজের পরিচয় দেবে। যদি কেউ লিখতে না পারে, তুমি নিজে তার হয়ে লিখে দাও।

প্রসাদ

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ডেভিড ইনেস নিখোঁজ ? কেন ? কখন ?
রাজধানী সারি-শহর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ! ইনেস কিংবা তাঁর স্ত্রী জখম হননি... কিন্তু ইনেস হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান !
লোকে বলাবলি করছে, ভূমিকম্পের কারণটা তিনি জানতেন...প্রতিরোধের জন্যে তিনি প্রস্তুতও হচ্ছিলেন...কিন্তু তারপরেই তিনি উধাও হয়ে গেলেন !
সবাই এখন সম্রাট ইনেসকে খুঁজছে ! আমি যাচ্ছি লো-হারের অধিপতি ভন হর্স্টের কাছে। তাঁকে একটা জরুরী বার্তা পৌঁছে দিতে হবে !
লেফটেন্যান্ট ভন হর্স্ট ? সেই আমাদের প্রথম যাত্রায় যিনি ও-২২০ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন ? চলো, আমিও যাব !
বেশ, ইচ্ছে হলে এসো !
টারজান লোকটা তেজী আছে ! জেন কুয়ার ধমকে ঘাবড়াবে না !
জেন কুয়া, এবারে বলো, ইনেস কীভাবে নিখোঁজ হলেন !
ও-কথা পরে হবে ! আগে দ্যাখো...
হরিব্‌রা আবার আমাদের দিকে ফিরে আসছে !
ভয় নেই, মাথার উপরে আমার উড়োজাহাজ ও-২২০ আছে !
উড়োজাহাজী জাদুতে আমার বিশ্বাস নেই !
আমি বিশ্বাস রাখি আমার ঢাল-তরোয়ালে !
2456 4-2

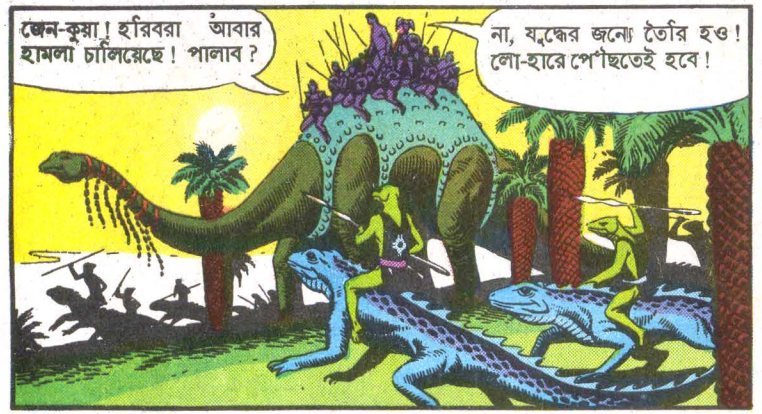

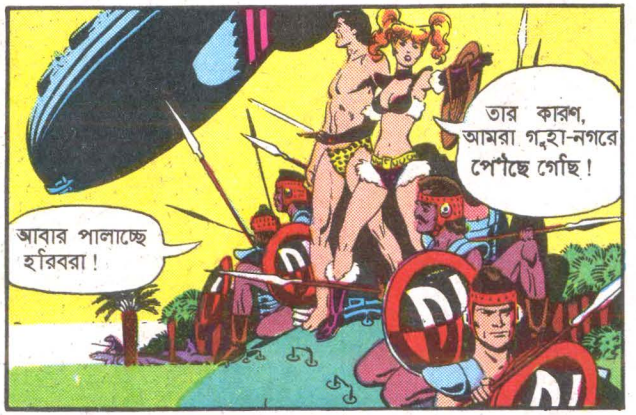

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শব্দ সন্ধান

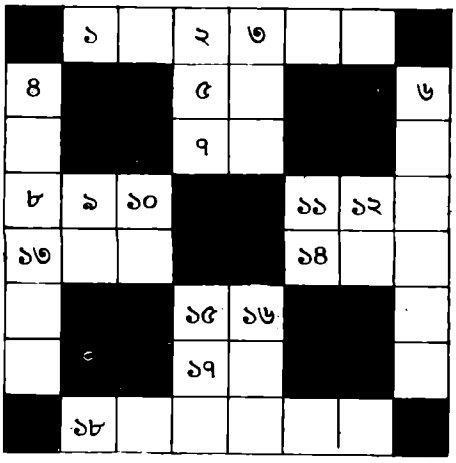

এখন থেকে দেওয়া হবে পাঁচমিশেলি শব্দ-সন্ধান। এক-একটা বিষয় নিয়ে এতদিন যে শব্দ-সন্ধান তোমরা করছিলে তা অনেকের কাছেই একঘেয়ে হয়ে উঠছিল, তাই মুখ পালটানোর ব্যবস্থা করা হল।

সংকেত ঃ পাশাপাশি ঃ (১) বিশ্ব-সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস। (৫) রসনা। (৭) একটি স্ত্রী-প্রত্যয়। (৮) নদীর নাম। (১১) শিকারী। (১৩) পূরণ-বাচক শব্দ। (১৪) মূল্যবান ধাতু। (১৫) দ্ব্যর্থক শব্দ—এক অর্থে দেবী, আর-এক অর্থে জন্তু। (১৭) কারক-বিশেষ। (১৮) বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস।

উপর-নীচ ঃ (২) বিছানার ঢাকা। (৩) নক্ষত্র। (৪) বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস। (৬) নাম শুনে মনে হয় কবিতা, কিন্তু উপন্যাস। (৯) কবিতায় বা প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ। (১০) গাছ। (১১) যে-জাতির নামে বর্ষগণনা হয়। (১২) একটি ইউরোপীয় দেশের রাজধানী। (১৫) বন্দিত্বের প্রতীক। (১৬) যে-আনাজ দুঃসংবাদ বয়ে আনে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

১ চাঁ	দে	র	২ পা	হা	ড়	
ই			গ			৩ আ
৪ বু	ড়ো	আং	লা			বো
ড়ো			দা			ল
র		৫ শি	শু	ক	বি	তা
পুঁ						বো
থি		৬ হ	য	ব	র	ল

ধাঁধা

মায়ের কাছে শুনলাম প্রথমে। শুনেই ছুটলাম চিলেকোঠার ঘরে। খাটের কোনায় বসতে-বসতে বললাম "গৌরীরা এসেছিল ছোটকা?"

"ক গোল দিলে সতুবাবু?" ছোটকা আমার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে নিজেই পালটা প্রশ্ন করল। বুঝলাম, ছোটকা এখন মজা করবে। খেলার রেজাল্ট নিশ্চয়ই জানে ছোটকা। আমাকে খেপাতে চাইছে। তাই জবাব না দিয়ে আবার বললাম, "বলো না, গৌরীরা কী বলে গেল? ধাঁধা এনেছিল বুঝি?"

গৌরী আমার মামাতো বোন। যখনই আসে, ধাঁধা নিয়ে আসে একটা করে। এমন-কী, চিঠি লিখেও মাঝে-মাঝে ধাঁধা পাঠায় ছোটকার কাছে। আর সেসব ধাঁধা দারুণ-দারুণ সব ধাঁধা।

"তাহলে গোল দেওয়া হল না!" ছোটকা আবার মজার মুখ করে বলল, "মিছিমিছি এত দৌড়ঝাঁপ। শেষ পর্যন্ত ড্র হল?"

আমি চুপ। ছোটকার বোধহয় মায়া হল আমাকে দেখে। বলল, "গৌরীরা এসেছিল। ধাঁধা দিয়ে গেছে।"

"কই দেখি, দেখি।" আমি হাত বাড়ালাম।

ছোটকা বলল, "লিখে আনেনি। ধাঁধা হয়েই এসেছিল গৌরীরা। গৌরী আর তার তিনজন নতুন বন্ধু। মায়া, নীলা আর প্রতিমা।"

"ধাঁধা হয়ে এসেছিল মানে?" আমি ঠিক বুঝতে পারি না। মায়া, নীলা, প্রতিমাকে দেখিওনি কখনো।

"একজন এসেছিল গেরুয়া রঙের শাড়ি পরে। একজন নীল শাড়ি। আর দুজনের শাড়ির রঙ সবুজ আর বাদামী। কে কোন্ রঙের শাড়ি পরেছিল বলো তো সতুবাবু?" ছোটকা বলে গেল।

"কী করে বলব?" আমি ক্রমশই ঘাবড়ে যাই প্রশ্ন শুনে। আমি কি হাত গুনতে জানি?

ছোটকা কিন্তু অবিচল। হেসে বলল, "কী করে বলবে, তাই তো? তাহলে তিনটে সূত্র দেওয়া দরকার তোমাকে। বেশ লিখে নাও।"

আমি কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হয়ে নিই। ছোটকা বলে গেল—

(ক) কোনো মেয়ে এমন রঙের শাড়ি পরেনি, যে-রঙের প্রথম অক্ষর তার নামের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে এক। অর্থাৎ, গৌরী যেমন গেরুয়া রঙের শাড়ি পরেনি, এইরকম আর-কী।

(খ) গৌরী আর মায়া বাদামী রঙের শাড়ি-পরা মেয়েটির পছন্দের প্রশংসা করছিল। ওই রঙ মেয়েটিকে খুব মানায়।

(গ) নীলা বলছিল যে, তার বাদামী রঙের কোনো শাড়ি নেই, গেরুয়া রঙের শাড়িও নেই। এ-দুটো রঙ কোনোদিন পরেনি সে।

এই সূত্র থেকে বলতে হবে কে কোন্ রঙের শাড়ি পরেছিল। এটাই **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একজন পুরনো মুদ্রা জমায়। হঠাৎ তার হাতে এল একটা রৌপ্য-মুদ্রা। তাতে লেখা খ্রীস্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ। সে দেখেই বুঝতে পারল, মুদ্রাটি জাল। কী করে বুঝল?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোথায় আশ্বিন আসে অগ্রহায়ণের পরে?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ শূন্য স্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

১৮	২	১৬
১৫	৬	৯
১৯	৯	৫

গতবারের উত্তর ॥ বাড়ি থেকে বেরুবার আগে দেয়াল-ঘড়িটায় দম দিয়ে চালিয়ে গিয়েছিল ছোটকা। ফিরে এসেই আবার ঘড়ি দেখেছে। সময় যতটা বদলেছে, তার মধ্যে ছোটকার রামবাবুদের বাড়িতে যাওয়া-আসা ও সেখানে সময়-কাটানো ঘটেছে। রামবাবুদের বাড়িতে ঢুকেই ঘড়ি দেখেছে ছোটকা, আবার দেখেছে বেরুবার ঠিক আগের মুহূর্তে। ফলে সেই সময়টা—কতক্ষণ রামবাবুদের বাড়িতে কাটিয়েছে—ছোটকার জানা। তাহলে নিজের বাড়ির দেয়াল-ঘড়িতে পাওয়া পুরো সময়ের হিসেব থেকে রামবাবুদের বাড়িতে থাকার সময় বাদ দিয়ে যা রইল, তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলেই ছোটকা রামবাবুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরার সময়টা বার করে ফেলেছে। বেরুবার সময় রামবাবুদের বাড়িতে দেখা সময়ের সঙ্গে এই সময়টুকু যোগ করে দিয়ে ছোটকা দেয়াল-ঘড়িটাকে ঠিকঠিক মিলিয়ে দিয়েছে।

(২) সংখ্যাটি ১৪

(৩) সাইকেল চালকরা মুখোমুখি হবে ৬ ঘণ্টা পরে। ওই ছ ঘণ্টাই মাছিটা ওড়াউড়ি করেছে। সুতরাং সে উড়েছে ৬×৩০=১৮০ মাইল।

(৪) বন্ধনীর দু-পাশের সংখ্যা যোগ করে যোগফলকে তিন দিয়ে ভাগ করলে মাঝের সংখ্যা পাওয়া যায়। সুতরাং উপযুক্ত সংখ্যাটি হল ১১।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

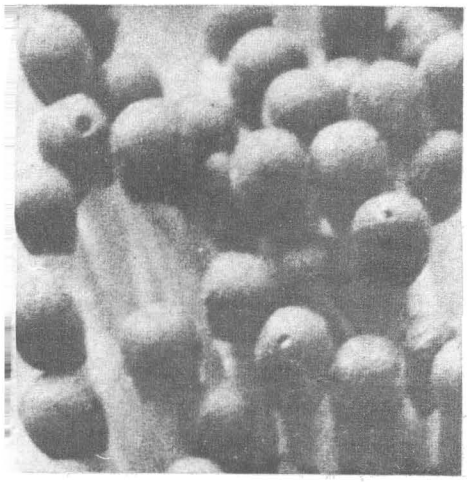

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল উপবিষ্ট অবস্থায় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকা একজন মানুষের ছবি। ফোটো তপন দাশ

উত্তর ঝটে

প্রঃ ধরো এক বাড়িতে বেড়াতে গেছ। সেখান থেকে চলে আসবার সময় তোমার হাতে দুটো লজেন্স দিয়ে বলল, একটা তুমি খেয়ো, আর একটা তোমার ভাই-এর জন্যে। ওরা জানত না, তোমার একটি বোনও আছে বাড়িতে। দুটো লজেন্স কী করে তিনজনে ভাগ করে নেবে?

উঃ অত শক্ত অংক আমি করতে পারব না, পথে দুটোই খেয়ে ফেলব।

প্রঃ পোস্টকার্ড আর টেলিগ্রাম একসঙ্গে কী হয়?

উঃ 'ডাকতার'।

প্রঃ কুস্তিগির গামার সঙ্গে আমার একবার লড়াই হবার কথা ছিল, তিন মন ওজনের সেই চ্যাম্পিয়ন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি কলি গেয়ে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। বলো তো গানের কলিটি কী?

উঃ 'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো।'

প্রঃ কোন জিনিস একবার বেরোলে আর তাকে ঘরে ঢোকানো যায় না?

উঃ টুথপেস্ট।

প্রঃ নিউটন একটা গাছের তলায় বসে ছিলেন, আর একটা আপেল ধপ করে মাটিতে পড়ল। এর থেকে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণিত হয়েছিল?

উঃ এর থেকে প্রমাণিত হল যে, গাছটা আপেল-গাছ ছিল।

সুসেন

মজার খেলা

তিনটে খালি কাপ সাজিয়ে রাখো টেবিলে। দুটো উপুড় করা অবস্থায় থাকবে, মাঝেরটা থাকবে সোজা। অর্থাৎ এইরকম-

এবার বন্ধুদের বলো, তিন দানে কাপগুলোকে সব সোজা করতে হবে। দান দেবার শর্ত হল, একেক দানে যে-কোনো দুটো করে কাপ দু-হাতে নিয়ে উল্টো করে ফেলতে হবে, এইভাবে ঠিক তিন দানে—কমও নয়, বেশিও নয়—সব কটা কাপ সোজা করতে হবে।

তুমি একবার দেখিয়ে দাও। তোমার হবে, কিন্তু বন্ধুরা পারবে না কিছুতেই। কী করে হবে ভাবছ? খুব সোজা ব্যাপার। তোমার তিন দান হবে এইরকম—(১) ক ও খ কাপ দুটোকে উল্টে দাও। (২) এবার ক ও গ কাপ দুটোকে উল্টে দাও। (৩) শেষ দানে আবার ক ও খ কাপ দুটোকে উল্টে দাও। এইভাবে তিন দানে দেখবে তিনটে কাপই সোজা হয়ে গেছে।

এবার বন্ধুদের করতে বলো। তার আগে একটু চালাকির ব্যাপার রয়েছে। মাঝের কাপটাকে উল্টে দু-পাশের কাপ দুটোকে সোজা করে রাখো এবার। অর্থাৎ তুমি যে-ভাবে শুরু করেছিলে এখন কাপগুলো আর সে-চেহারায় নেই। কিন্তু চট করে এই তফাত কারও চোখে পড়বে না। তারা তোমার দেখানো দান মনে রেখে করতে যাবে। কিন্তু তিনটে কাপ সোজা হবে না সেক্ষেত্রে। কাপের হ্যান্ডেলগুলো একই দিকে যেন থাকে—এ-কথাও বলে দিয়ো বন্ধুদের। কথাটা না বললেও চলে। কিন্তু বন্ধুরা এতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। তোমার আরম্ভের সঙ্গে তাদের আরম্ভের তফাত খেয়াল করবে না।

তোমার তিন দান :

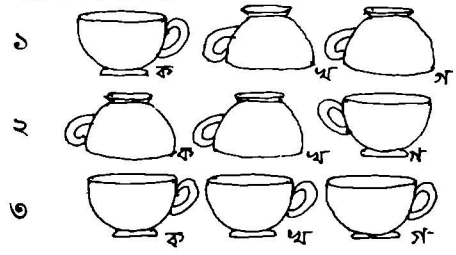

বন্ধুদের দিচ্ছ এইভাবে :

মজারু

আটখানা

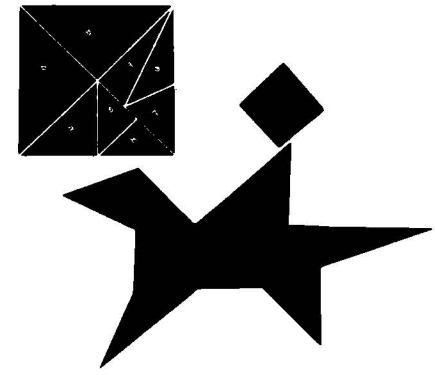

এবারের আটখানাতে দ্যাখো, তোমাদের একজন খুদে বন্ধুকে হাজির করেছি। খুদে হলে কী হবে, ঘোড়ায় চড়ার তার খুব শখ। বইতে ছবি দেখেছে সে ঘোড়ায়-চড়া মানুষ, অতএব তাকেও ঘোড়ায় চড়তে হবে। নইলে হুলুস্থুলু বাধাবে। বুঝতেই পারছ হুলুস্থুলু বাধাবার আগেই ওকে এনে দেওয়া হয়েছে একটা সুন্দর কাঠের ঘোড়া। আর ঘোড়া পেয়ে সেই দস্যি খোকা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। 'হ্যাট ঘোড়া' 'হ্যাট ঘোড়া' করতে করতে সে এখন ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়েছে। এই চমৎকার দৃশ্যটুকু এবার তোমাদের জন্য আটখানাতে ধরে রেখেছি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

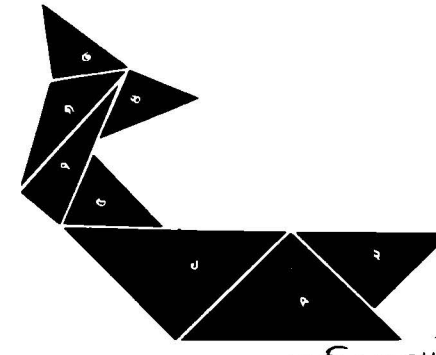

অসিত পাল

শুধু একবার

লক্ষপতি হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় কী? এ নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। যদি তোমাদের কারো লক্ষপতি হওয়ার ইচ্ছে থাকে, প্রতোক মাসে দশহাজার টাকা করে ব্যাঙ্কে জমা দেবে। যদি দুএক মাস টাকাটা জমা নাও দিতে পারো, কিছু যায় আসে না, এক বছরের মধ্যে লক্ষপতি হবেই হবে। —তা-রা

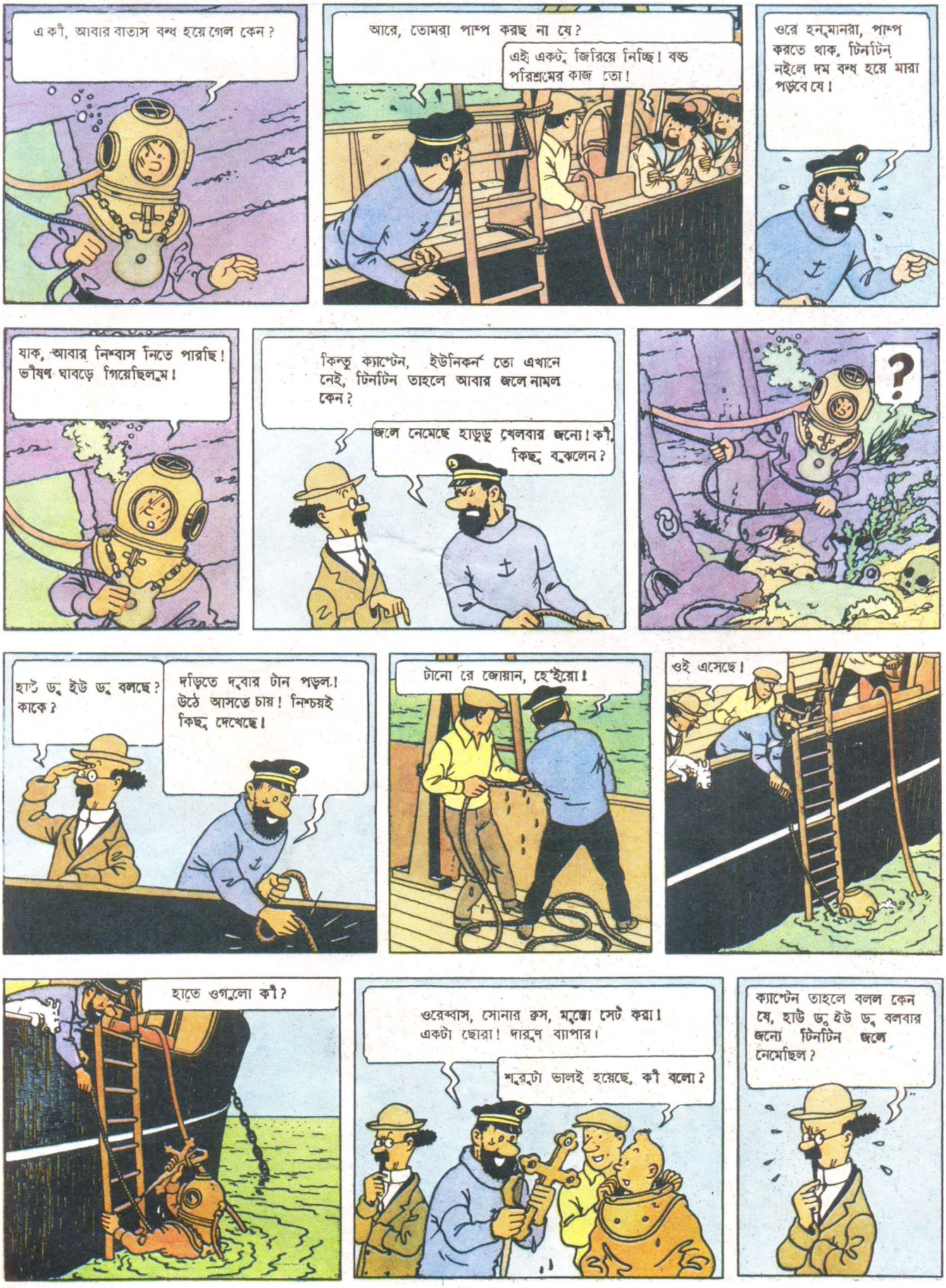
এ কী, আবার বাতাস বন্ধ হয়ে গেল কেন?
আরে, তোমরা পাম্প করছ না যে?
এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি! বড্ড পরিশ্রমের কাজ তো!
ওরে হনুমানরা, পাম্প করতে থাক, টিনটিন নইলে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে যে!
যাক, আবার নিশ্বাস নিতে পারছি! ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম!
কিন্তু ক্যাপ্টেন, ইউনিকর্ন তো এখানে নেই, টিনটিন তাহলে আবার জলে নামল কেন?
জলে নেমেছে হাড়ুডু খেলবার জন্যে! কী, কিছু বুঝলেন?
?
হাউ ডু ইউ ডু বলছে? কাকে?
দাঁড়িতে দুবার টান পড়ল! উঠে আসতে চায়! নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে!
টানো রে জোয়ান, হেঁইয়ো!
ওই এসেছে!
হাতে ওগুলো কী?
ওরেব্বাস, সোনার ক্রস, মুক্তো সেট করা! একটা ছোরা! দারুণ ব্যাপার!
শুরুটা ভালই হয়েছে, কী বলো?
ক্যাপ্টেন তাহলে বলল কেন যে, হাউ ডু ইউ ডু বলবার জন্যে টিনটিন জলে নেমেছিল?

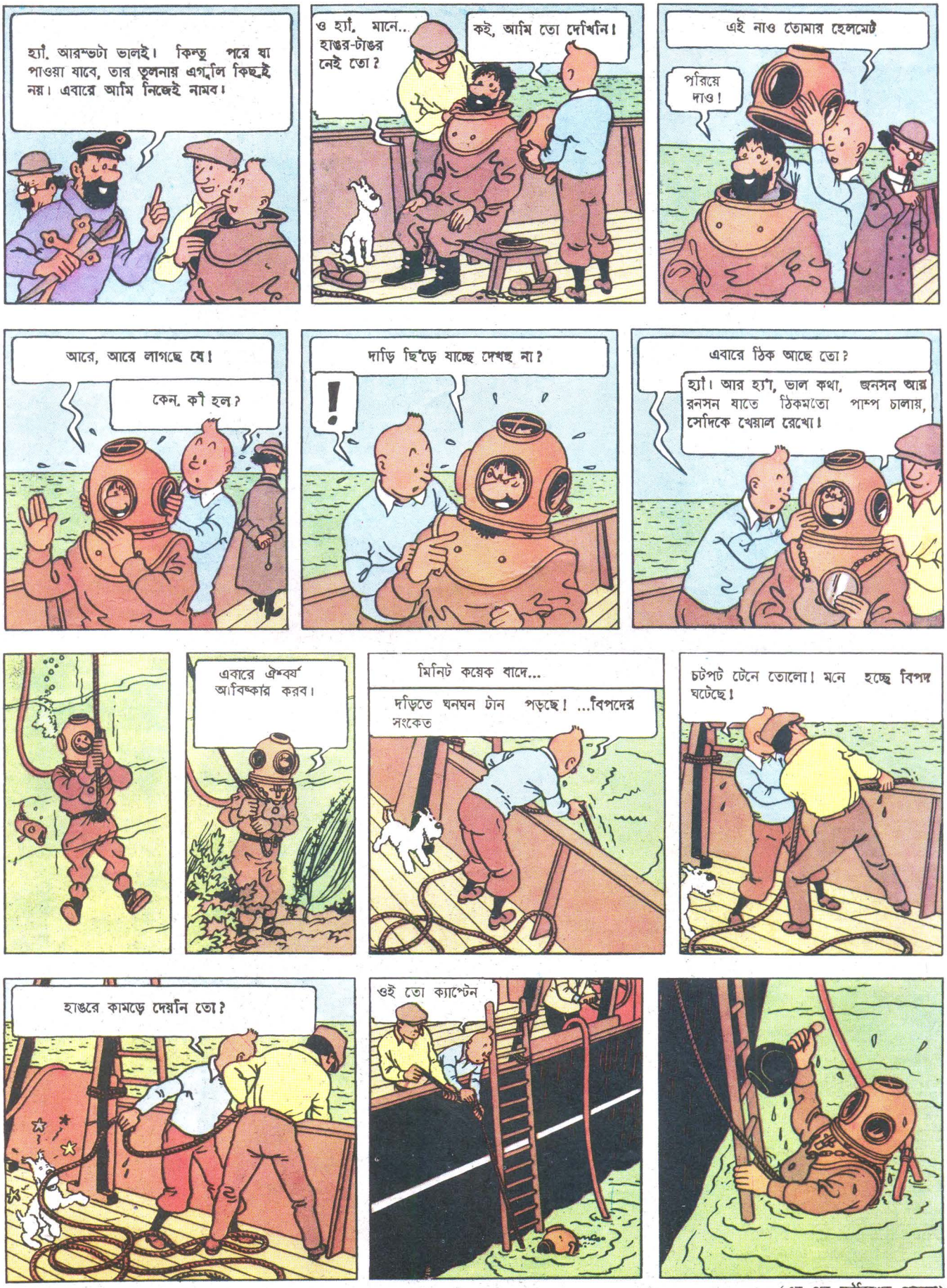

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

লেখাপড়া

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

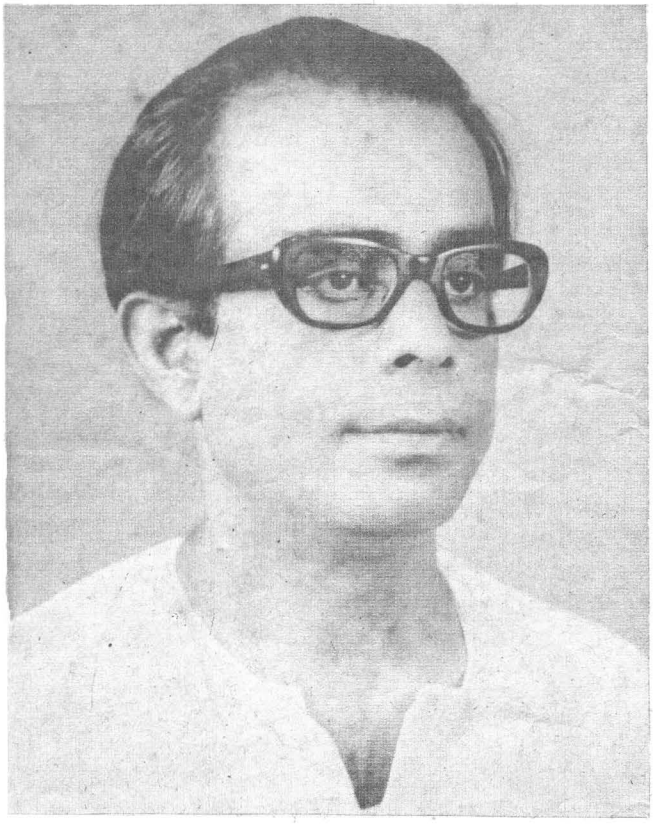

পশ্চিম বাংলার যে-সব স্কুলের শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গেছে, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল তাদের একটি। আগে কৃষ্ণনগর কলেজের সংলগ্ন ছিল। এখন যে-বাড়িতে আছে সেটি বঙ্গবন্ধু ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের দান। সে-যুগের বঙ্গসমাজে শিক্ষা ও স্বদেশী আন্দোলনে মনোমোহন ঘোষ একটি সুপরিচিত নাম।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের অনেকেই উত্তরজীবনে বিখ্যাত হয়েছেন। বাঘা যতীন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, হুমায়ুন কবীর এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। নেতাজীর অন্যতম শিক্ষক বেণীমাধব দাশ একসময় এই স্কুলেও শিক্ষকতা করে গেছেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল করে। পাশের হার প্রায় প্রত্যেকবারই শতকরা একশ'। স্ট্যান্ডও করে এই স্কুল থেকে : ১৯৬৩-তে দ্বিতীয় (বিজ্ঞান), ১৯৬৪-তে দ্বিতীয় ও দশম (টেকনোলজি), ১৯৬৭ পঞ্চদশ (বিজ্ঞান)। এই বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম।

প্রধান শিক্ষক শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রায় কুড়ি বছর শিক্ষকতা করছেন। কলেজিয়েট স্কুলে আছেন বছরখানেক। শিগগির বারাসত গভর্নমেণ্ট স্কুলে বদলি হওয়ার কথা। এতদিনে বোধহয় চলেও গেছেন। অজিতবাবু ইংরেজির লোক।

জিজ্ঞেস করলাম, "ভাল ফল করতে গেলে কীভাবে তৈরি হওয়া উচিত ছেলেমেয়েদের?"

"গোড়া থেকেই রুটিন করে লেখাপড়া করা দরকার। তবেই লেখাপড়াটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া, সমস্ত টাস্ক ঠিকমতো করা—যার মধ্যে আসছে পড়া এবং লেখা দুই-ই। চার ঘণ্টা লেখাপড়া করলে, অন্তত দুটি ঘণ্টা লেখাতেই ব্যয় করা উচিত। লেখাপড়ার সময়ের মধ্যে এই ৫০ : ৫০ অনুপাতটা বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয়। আর যা লিখবে ছেলেমেয়েরা, তা যেন কোনও যোগ্য ব্যক্তি সংশোধন করে দেন। এ ছাড়া আর দুটো জিনিস খুব দরকার। প্রথমত, পাঠ্য বিষয়ের সমস্যা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময় চাই—তা সে ক্লাসের ছেলেমেয়ের সঙ্গেই হোক, আর অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই হোক। দ্বিতীয়ত, সঠিক উত্তর লেখার জন্যে প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। ভাল ফল করতে গেলে ছেলেকে বা মেয়েকে 'অলরাউণ্ডার' হতে হবে। কয়েকটা বিষয়ে 'স্ট্রং' হলে চলবে না।"

অভিজ্ঞতা থেকে অজিতবাবু বললেন, "বর্তমান মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে ইংরেজিতে লেটার মার্কস পাওয়ার সুযোগ বেশি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এখন যে-রকম প্রশ্ন হয়, তাতে সকলের উত্তর তো মোটামুটি একই হবে। তাহলে কী ভিত্তিতে লেটার দেবেন আপনারা?"

হেসে বললেন, "সেণ্টেন্সের গঠন, শব্দভাণ্ডারের বিস্তার আর ফ্রেজ-ইডিয়ম-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাল আর মন্দ বাছাই হয়ে যায়।"

"ইংরেজিতে ভাল উত্তরের চিহ্ন কী কী?"

"আগে যা বললাম, তার ভিত্তিতে দেখাতে হবে ভাষার উপর দখল কতটা আছে। এছাড়া, সঠিক উত্তর আর নির্ভুল পয়েণ্টস দিতে হবে।"

"এর জন্যে কী ভাবে পড়া উচিত?"

"সাধারণভাবে বলা যায়, পড়ার অভ্যাস বা প্র্যাকটিসটাই বড়। 'প্র্যাকটিস লিডস টু পারফেকশন'—এটা তো সকলেই জানে। আরো গভীরে গেলে বলতে হয়, এই অভ্যাসটা প্রণালীবদ্ধ বা 'সিস্টেমেটিক' হতে হবে।"

"তার মানে?"

"মানে, টেক্সট বইটা ছেলেমেয়েরা যন্ত্রের মতো পড়বে না, মাথা খাটিয়ে পড়তে হবে। একটা নির্দিষ্ট 'পিস' যখন পড়ছে, তখন তারা যেন সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় ভালভাবে বুঝে নেয়—তা ভোকাবুলারি বলুন, আর গ্রামারই বলুন।"

"বাংলার সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আপনি এক কথাই বলবেন?"

"না। মাধ্যমিক সিলেবাসে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার একটা বড় তফাত আছে। ইংরেজিতে যেখানে টেক্সট-এর ভাষার গঠনটা নিয়ন্ত্রিত সিলেবাসের প্রয়োজন মেটাচ্ছে, বাংলার ক্ষেত্রে তো আর তা নয়। কারণ বাংলা যে এ-রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা। তাই বাংলার পেপারে তাদের কাছে কিছুটা সাহিত্য-সচেতনতা, কিছুটা রসজ্ঞান বা রসানুভূতি আশা করা হয়—যেটা ইংরেজিতে করা হয় না। আর এর জন্যে দরকার মাতৃভাষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যথাসম্ভব বেশি পরিচয়। দখল। যেটা করতে হলে খুব বেশি করে ক্লাস, লাইব্রেরির ব্যবহার করা উচিত। টেক্সট অবশ্যই ভালভাবে পড়বে, সঙ্গে-সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যাকরণগত বিষয়গুলি লক্ষ করবে। মোট কথা,

ভাষার প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে জানতে হবে।"

বিজ্ঞানের দুজন শিক্ষক, কেমিস্ট্রির শ্রীপ্রতুলকুমার কর ও লাইফ সায়েন্সের শ্রীঅজিতকুমার হালদার পঞ্চায়েত নির্বাচন-সংক্রান্ত কী-একটা কাজে প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকেছিলেন। দুজনকেই আটকালাম। প্রতুলবাবুর কাছে শুনতে চাইলাম ফিজিক্যাল সায়েন্সে ভাল পড়াশোনা সম্পর্কে দু'চার কথা। উনি বললেন, ভাল ফল করতে গেলে পুরনো হায়ার সেকেন্ডারির বই পড়া খুবই দরকার। আর ল্যাবরেটরির ব্যবহার। উত্তর লিখতে হবে টু দা পয়েন্ট। অতিরিক্ত লেখার প্রবণতা বর্জন করতে হবে। লাইফ সায়েন্সের অজিতবাবুও বললেন, একটা বই থেকে কখনোই পড়া উচিত নয়। আর পুরনো হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের বই পড়া উচিত এবং প্রশ্নোত্তরের অর্থাৎ 'কোশ্চেনস অ্যান্ড আনসার্স' জাতীয় বই ব্যবহার করা উচিত—তবে উত্তর লেখবার জন্যে নয়, প্রশ্ন দেখার জন্যে। পুরনো হায়ার সেকেন্ডারি বইগুলোয় অনেক কিছু বেশ ডিটেলে আছে—যেমন ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ। তবে মুশকিল হল, লাইফ সায়েন্স পড়াবার উপযুক্ত শিক্ষকের খুব অভাব। বিশেষত মফস্বলে।

অঙ্ক সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক বললেন, সাফল্যের মূল কথা হল গতিবেগ আর সঠিক উত্তর লেখা, এ দুটোকে একত্রে বজায় রাখা। অবশ্যই তার জন্যে দরকার নিয়মিত অভ্যাস। এবং সুযোগ্য শিক্ষক, যিনি বিষয়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি সম্পর্কে ছাত্রকে সজাগ করে রাখবেন। ভূগোলে চার্ট, গ্লোব, ম্যাপের ব্যবহার খুবই দরকার। আর দরকার মাঝেমধ্যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আউটিং করা। যাতে তারা বাস্তব জ্ঞান লাভ করে।

ইতিহাসে বড়-বড় উত্তর লেখা উচিত নয়। শিক্ষকদের নির্দেশমতো রেফারেন্স-বই পড়তে হবে। আর মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের উত্তরে বড় জিনিস হল উপস্থাপনা—ওতে নম্বরের তফাত হয়।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় রঞ্জন সরকারের বাবা শ্রী অমরেন্দ্রনাথ সরকার কৃষ্ণনগরের বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র অধ্যাপক। এর আগে ক্লাস টেনে ফার্স্ট হত যে গৌতম মণ্ডল, সে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মণ্ডলের ছেলে। (গৌতম এবারে মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছে। এই সংখ্যাতেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে নাও।)

রঞ্জন প্রতি বৎসরই ফার্স্ট হচ্ছে। সেই ওয়ান থেকেই। স্কুলে ওর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা হল অলোককুমার দত্ত, বাসুদেব শেঠ। রঞ্জন এখন রোজ সাধারণত পাঁচ কি ছ' ঘন্টা পড়ে, ছুটি থাকলে সাত-আট ঘন্টা। বলল, "চেষ্টা করছি পড়ার সময় আরও কিছুটা বাঁড়াতে।" কারণ ও ভাল ফল করার আশা রাখে। শুধু তাই নয়, ফিজিকস নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছে ওর আছে।

সঙ্গতভাবেই রঞ্জনের প্রিয় বিষয়টি হল ফিজিক্স, যদিও সিলেবাসে ফিজিক্স-এর অস্তিত্ব ফিজিক্যাল সায়েন্সের একটা অংশ হিসেবে—আলাদাভাবে ফিজিক্স বলে কোনো বিষয় মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে নেই। বিজ্ঞানের আর একটি বিষয়—লাইফ সায়েন্স নিয়ে—রঞ্জনের কিছুটা অসুবিধা হয়। তবে এ-কথা ও জানে যে, ভাল ফল করতে গেলে ঐ অসুবিধাকে অতিক্রম করতেই হবে।

রঞ্জনের লেখাপড়ার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম। কতকগুলো বিষয়ে ও পড়ায় জোর দেয়। যেমন সংস্কৃত, ভূগোল। বাকিগুলো—ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, ফিজিক্যাল সায়েন্স ইত্যাদিতে ও লেখার উপর বেশি জোর দেয়। রঞ্জন আগে বই ও টেস্ট পেপার্স দেখে ঠিক করে নেয় কী-কী প্রশ্ন হতে পারে। তার-পর সেগুলো বোঝবার চেষ্টা করে। বার দু'তিন রীডিং পড়লেই হয়ে যায়। পড়ার পর ক্ষেত্রবিশেষে লিখে ফেলে।

ইংরেজি ও বাংলা সম্পর্কে রঞ্জনের বক্তব্য এই যে, শুধু টেক্সট বই পড়ার কোনো অর্থ হয় না। তাই টেক্সট-এর সঙ্গে-সঙ্গে নোটসও ব্যবহার করে। তবে একাধিক নয়, মাত্র একটি করে। ইংরেজিতে টেক্সট বহির্ভূত অংশের জন্যে ও ব্যবহার করে পি কে দে সরকার-এর পুরনো

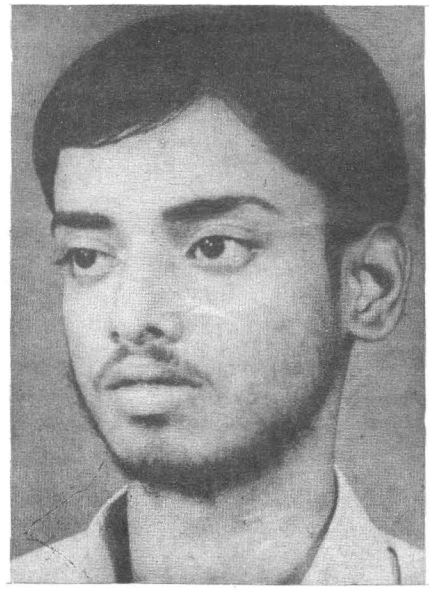

সংস্করণ, আর ব্যোমকেশ ঘোষ। বাংলা রচনা ও ব্যাকরণের জন্যে স্কুলে পড়ান হয় পি আচার্য, অমিয়া সেন। রঞ্জন ডঃ দাশ-গুপ্ত, বিভূতি চৌধুরী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইও পড়ে।

সংস্কৃতের জন্যে রঞ্জন ব্যবহার করে দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত ব্যাকরণকৌমুদী ছাড়াও ভূজঙ্গভূষণ-বাবুর সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা আর হেল্পস টু দি স্টাডি। ভূগোলে স্কুলের বই রায় ও চক্রবর্তীর 'ভারত ও ভূমণ্ডল'। রঞ্জন আরও পড়ে সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ও জগদীশ ঘোষের 'ভারত-বসুধা'। আর 'ভূপরিচয়' বইটি। সেই রকম, ইতিহাসে ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরীর বই ছাড়াও ও পড়ে ডঃ এ সি রায়ের বই। এবং অন্য কোনও ভাল বই পেলে তাও।

রঞ্জন নিয়মিত অঙ্ক অভ্যাস করে। অঙ্কের জন্যে ব্যবহার করে কে পি বসু ও কেশবচন্দ্র নাগের বইগুলি। অতিরিক্ত অঙ্কের জন্যেও ও কেশবচন্দ্র নাগের বই ব্যবহার করে। আর তার লেখা পুরনো বই, অর্থাৎ আবার হায়ার সেকেন্ডারি সিলেবাস অনুযায়ী লেখা বইটি। ফিজিক্যাল সায়েন্সে স্কুলে পড়ান হয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সমর গুহর বই।

জীবন-বিজ্ঞানে স্কুলের বুক-লিস্টে আছে কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু। রঞ্জন অন্যান্য যে-সব বইয়ের সাহায্য নেয় সেগুলির লেখক ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, কার্তিক মণ্ডল, এন মল্লিক আর অমল চক্রবর্তী। রঞ্জন আনন্দমেলার গ্রাহক। প্রথম সংখ্যা থেকেই। ভাল লাগে আনন্দমেলার ছবি, উপন্যাস আর গল্প। কিন্তু ওর কাছে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ খেলার অংশটি। বলল, "বাংলায় যত পত্রিকা আছে তার মধ্যে আপনাদের খেলাধুলোর ট্রিটমেন্টটা সব-চেয়ে ভাল।"

'ফিজিক্যাল এডুকেশন'-এর জন্যে রঞ্জন যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করে ওদের নেদিয়ারপাড়া বারোয়ারিতলার বাড়িতে। এ-ছাড়া খেলাধুলো বিশেষ করে না। অবসর সময়ে ও ছবি আঁকতে ভাল-বাসে। কবিতা লেখে। গল্পের বই পড়ার নেশাও আছে। রঞ্জনের প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

(একত্রিশের পাতার পর)

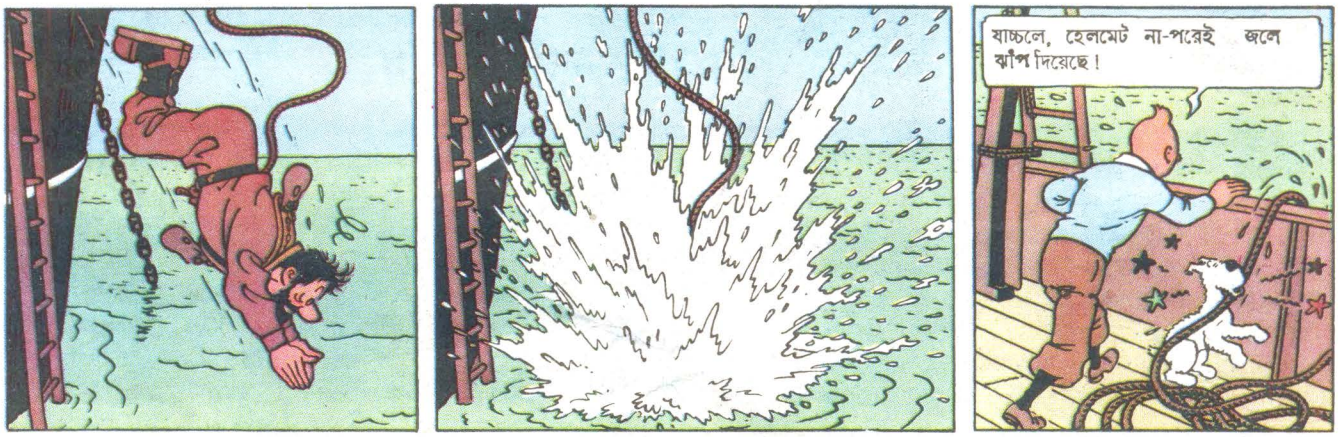

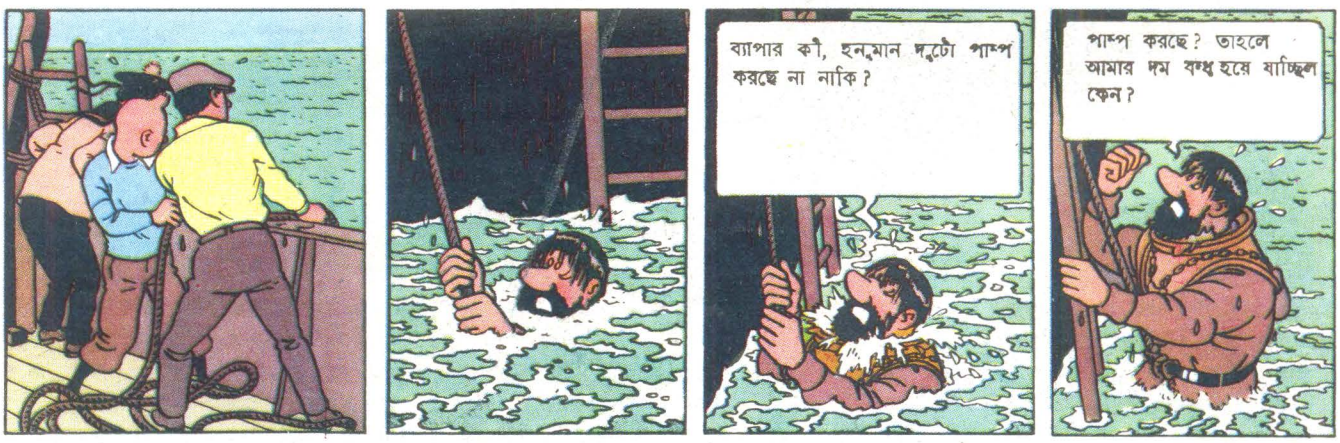

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

গোয়েন্দা বাজ

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা একটা ভূতুড়ে ছবি দেখতে সিনেমায় গিয়েছিল। ছবি দেখতে বসে সে এমন এক অদ্ভুত মানুষকে দেখল, যে খুশি-মতন মরে যায়, আবার বেঁচে ওঠে। ভয় পেয়েছিল বরদা খুবই। পরে লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল অবশ্য। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ওঁর কাজ হল মানুষ নিয়ে গবেষণা। সাধারণ মানুষ নয়, এমন সব মানুষ, যাদের মধ্যে অস্বাভাবিক অলৌকিক কোনো গুণ রয়েছে। দুমকার কাছে সেই গবেষণা-কেন্দ্র।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে নিয়ে এলেন দুমকার সেই রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে মহাদেব বলে একটা লোক জুটেছিল, যার সঙ্গে বরদার চেহারার খুব মিল। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে বিশ্বাস করতেন না। মহাদেবকে তিনি শয়তান বলে মনে করতেন। মহাদেবের উদ্দেশ্য এই রিসার্চ সেন্টার থেকে দু-চার জনকে বাইরে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকাপয়সা কামানো, মানুষকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে জব্দ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বরদাকে আনার পর নিজেই জব্দ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রায় চোখের সামনেই এক টাঙাওয়ালা খুন হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর সন্দেহ করলেন সুজন বলে একটা লোক, যার গায়ে অসুরের মতন ক্ষমতা, সে মহাদেবের প্ররোচনায় খুন করেছে টাঙাওয়ালাকে। সন্দেহ করলেন বটে, কিন্তু সুজন কোথায়?

সুজনের খোঁজ চলতে লাগল। কিন্তু এরই মধ্যে মহাদেব এসে বরদাকে শাসিয়ে গেল। বলে গেল, দিন তিনেকের মধ্যে বরদা যদি কলকাতায় ফিরে না যায়, তবে তার অবস্থাও টাঙাওলার মতন হতে পারে।

ইতিমধ্যে আবার বরদার ঘরে ঢুকে কেউ তার সুটকেস খুলেছিল। খুলে জামাকাপড় কিছু নেয়নি অবশ্য, কিন্তু অদ্ভুত এক কাজ করেছে। সুটকেস থেকে বরদার নতুন মোজা বার করে তার জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। আর পুরনো মোজাজোড়া জুতো থেকে বার করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। সিদ্ধেশ্বর বললেন, এটা সুজনের জন্যেই করা হয়েছে। মহাদেবই করেছে। সুজন জামা-কাপড়ের গন্ধ শুঁকে তার মালিককে আক্রমণ করতে পারে। বরদা বড় ভয় পেয়ে গেল। সে আর থাকতে চাইল না। জেদ ধরল, তাকে কলকাতায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজি হলেন সিদ্ধেশ্বর। তারপর—

১৪

পরের দিন সকাল থেকেই বরদার মন কলকাতার জন্যে ছটফট করতে লাগল। আজ সে ফিরে যাচ্ছে। কাল সকালে তার নিজের বাড়িতে। এই সব মহাদেব, সুজন, এদের হাত থেকে বাঁচবে সে। সিদ্ধেশ্বরের কথায় ভুলে কী বাজে জায়গায় না এসে পড়েছিল! যত সব ভুতুড়ে কাণ্ড। শুধু ভুতুড়েই বা কেন, পৈশাচিক ব্যাপার-স্যাপার! এমন জানলে কে আসত এখানে!

সত্যি বলতে কী, বরদা যে কৌতূহল নিয়ে এসেছিল তা কিন্তু মিটল না। দু-একজন নিশ্চয় তাকে অবাক করেছে, যেমন অর্জুনপ্রসাদ ; তবে অবাকের চেয়ে ঘেন্না, বিরক্তি, রাগই তার বেশি হয়েছে। একটা নিরীহ টাঙাঅলাকে কেমন করে মারল এরা। আহা! এখানে গোপীমোহন, বংশীবদন যারাই থাক, যতই কেননা তাদের অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্ষমতা থাক, এদের মধ্যেই আবার মহাদেব আছে, সুজন আছে। শয়তানের দল।

সিধুবাবু তাঁর রিসার্চ সেন্টার নিয়ে থাকুন, বরদা তার নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলেই খুশি।

কলকাতার জন্যে মন ছটফট করলেও ভেতরে-ভেতরে একটা উদ্বেগ বোধ করছিল বরদা। কেমন যেন চাপা ভয়। সতীশ ডাক্তারের মোটর-বাইকের পেছনে চেপে তাকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে, অনেকটা রাস্তা, তাও আবার সন্ধেবেলা। কেউ কি জোর করে বলতে পারে রাস্তায় কিছু ঘটবে না! সুজন কোথায় ঘাপটি মেরে থাকবে কে জানে!

সবই যখন বুঝছেন সিদ্ধেশ্বর, আর সন্দেহও করছেন, মহাদেব সুজনকে লেলিয়ে দেবার জন্যে তৈরি, টাঙাঅলার মতন বরদারও ঘাড় মটকে যেতে পারে—তখন কেন তিনি বরদাকে সন্ধেবেলায় পাঠাচ্ছেন? সকালেও তো পাঠাতে পারতেন?

সিদ্ধেশ্বরের মতলবও বরদার ভাল লাগছিল না। ভদ্রলোক কেমন ফন্দি এঁটে তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন, কত রকম ভেলকি দেখিয়ে! কে জানে, কী মতলব তিনি মনে-মনে এঁটে রেখেছেন? আজ সন্ধেবেলায় বরদার ভাগ্যে কী রয়েছে ভগবানই জানেন!

কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে মন যতই ব্যাকুল হোক, দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল বরদার। ভয়ও পাচ্ছিল।

খানিকটা বেলায় বরদা নিজেই সিদ্ধেশ্বরের খোঁজ করতে গেল। অফিসে তিনি নেই। ঘরেও নয়।

আরও বেলায় বরদা যখন নিজের ঘরে বিরস. শুকনো মুখে শুয়ে-শুয়ে বিকেলের কথা ভাবছে, সিদ্ধেশ্বর তার ঘরে এলেন।

বরদা বিছানায় ওপর উঠে বসল। "আপনাকে খুঁজে খুঁজে ফিরে এলাম।"

"শুনেছি," সিদ্ধেশ্বর বললেন। বসলেন চেয়ারে।

বরদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। লক্ষ করল সিদ্ধেশ্বরকে, তারপর বলল, "আপনি আমার যাবার যে-ব্যবস্থা করেছেন তাতে আমার কেমন ভরসা হচ্ছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বর যেন হাসলেন, চাপা হাসি। বললেন, "ভয় পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ," বরদা স্পষ্ট করে বলল।

"ভয়ের কী আছে! আপনি তো সতীশের মোটর-বাইকের পেছনে থাকবেন। সে জোরেই গাড়ি চালায়। সুজন কি গাড়ির চেয়েও জোরে ছুটতে পারবে?"

"সে আপনি জানেন। আপনিই বলেছেন সে শিকারী কুকুরের মতন—।"

"সেটা তার ঘ্রাণ-শক্তির বেলায়। পায়ে ছোটার বেলায় নয়।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওই সুজনই তো ছুটন্ত টাঙায় উঠেছিল। ছুটন্ত টাঙাও কম জোরে যায় না।"

সিদ্ধেশ্বর যেন বড়দার বোকামিটা দেখছিলেন. বললেন. "টাঙা আর মোটরবাইকে অনেক তফাত। তাছাড়া, এমনও তো হতে পারে. সুজন টাঙাঅলাকে রাস্তার মধ্যে থামিয়েছিল। টাঙাঅলা কেমন করে জানবে যে, সুজন টাঙায় উঠে তার ঘাড় মটকাবে।"

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। সুজন টাঙা থামাতেই পারে. একা-একা ফিরে যাচ্ছে টাঙাঅলা, মাঠের মধ্যে হাত দেখালে সে, কেনই বা দাঁড়াবে না! তা ছাড়া এদিকে যদি আসা-যাওয়া থাকে টাঙাঅলার. তবে সুজনের মুখ অন্তত চেনা। বেচারা হয়ত ভেবেছিল, সুজন টাঙায় চড়ে খানিকটা যাবে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দিনের বেলায় যাওয়ার চেয়ে সন্ধেবেলায় যাওয়াই তো ভাল। দিনের বেলায় সুজন সবই দেখতে পায়, রাত্তিরে তার চোখের জোর একেবারেই কমে যায়। সেদিক থেকে আপনি নিরাপদ। একজন রাতকানা কতক্ষণ আর মোটর-বাইকের পেছন-পেছন ছুটবে?"

শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্‌পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৬·০০
শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহ্বান ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·০০
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০
বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
মউলির রাত ৫·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিনকুর ডাইরি ৩·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০
পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমগ্র কিশোর-সাহিত্য

১

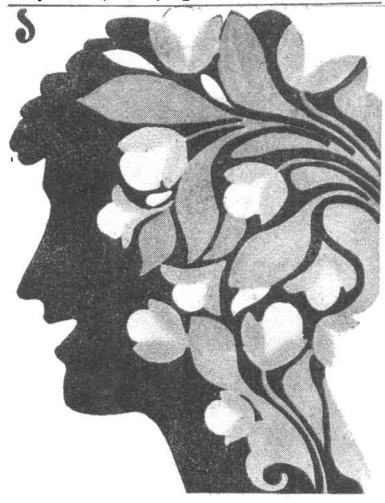

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক অবিস্মরণীয় চরিত্র আমদানী করেছেন কিশোরসাহিত্যে—সেই চরিত্রের নাম টেনিদা। ছোটবড় নির্বিশেষে সকলের প্রিয় এই টেনিদার যাবতীয় কাহিনী একসঙ্গে যাতে হাতের মুঠোয় পৌঁছে যায় তার জন্যেই খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র কিশোরসাহিত্য। শুধু টেনিদার আশ্চর্য মজাদার কাহিনীগুলিই নয়, সেই সঙ্গে থাকছে আরও অনেক দুর্ধর্ষ সব উপন্যাস-গল্প-ছড়া-কবিতা ও প্রবন্ধ। শুধু টেনিদার গল্পেই জিভে জল আসে, আর এই বইতে এত সব বাড়তি আকর্ষণ। এই বই নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বই
ঘন্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০
সমগ্র কিশোরসাহিত্য
(প্রথম খণ্ড) ২০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি ৬·০০
সবুজ দ্বীপের রাজা ৫·০০
মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কৃস্ট্যাল ১০·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার স্নেক ৪·০০
নীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অস্ত্রখনি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়া ঝকমারি ৭·০০
শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০
অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে বাবুই হৈ ৫·০০
মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০
রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০
শিলির কর
গঙ্গায় বাঘ ৪·০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০

বরদা খানিকটা ভরসা পাবার চেষ্টা করল। বাস্তবিকই সুজন যদি রাতকানা হয়ে যায়, তার পক্ষে মোটর-বাইকের পেছনে ছোটা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, সে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা কিছু ছুটতে পারে বরদাদের দিকে। সতীশ ডাক্তার নিশ্চয়ই সেটুকু সামলাতে পারবে।

"আপনি কাল বলেছিলেন," বরদা বলল, "আমরা যখন যাব আপনি কাছাকাছি থাকবেন। কোথায় থাকবেন?"

অন্যমনস্কভাবে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "থাকব। ঠিক কোথায় তা এখন বলতে পারছি না। তবে আপনাকে বিপদে ফেলে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকব না।"

বরদা এটা বিশ্বাস করে নিল। সিদ্ধেশ্বর সে-রকম মানুষ নন।

সামান্য চুপচাপ থাকল বরদা। তারপর বলল, "আচ্ছা, আপনি আমায় একটা কথা পরিষ্কার করে বলবেন?...কলকাতা থেকে আপনি আমায় খুঁজেপেতে—খুঁজেপেতে মানে ঘটনাচক্রে আমায় দেখতে পেয়ে এক মতলব ঠাউরে এখানে নিয়ে এলেন। মহাদেবের সঙ্গে আমার চেহারার মিল রয়েছে দেখেই ধরে এনেছিলেন আমাকে। কিন্তু এই চেহারার মিল দিয়ে কী করবেন ভেবেছিলেন আপনি? মানে, কেমনভাবে সেটা কাজে লাগাবেন ঠাওরেছিলেন?

সিদ্ধেশ্বর মুখ তুলে বরদার দিকে চেয়ে থাকলেন। কিছু ভেবেছিলেন। জবাব দেবার কোনো আগ্রহই যেন তাঁর নেই।

বরদা জবাবের আশায় অপেক্ষা করতে লাগল।

শেষে কথা বললেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমার একটা মতলব ছিল। আপনাকে বোধহয় আগেও বলেছি। আপনাকে মহাদেব সাজিয়ে দেখতাম, তার দলে ক'জন ভিড়েছে এখানকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতন হত ব্যাপারটা।"

"আমাকে মহাদেব সাজাতেন?"

"হ্যাঁ। আপনি যদি মহাদেব না সাজেন তাহলে তার সঙ্গে কাদের আঁতাত হয়েছে, কে কে তার দলে ভিড়েছে, কেমন করে জানব!"

"মানে, আমাকে দিয়ে আপনি মহাদেবের পার্ট করাতেন?"

"অনেকটা তাই।"

"আর আসল মহাদেব?"

"তার ব্যবস্থা হত। ওকে একটা দিন বা একটা রাত গুম করে রাখার মতন জায়গা আমাদের এখানে অঢেল।"

বরদা আরও কৌতূহল বোধ করে বলল, "আসল মহাদেব গুম হত, আমি নকল মহাদেব হয়ে কেমন করে তার আঁতাতের লোকদের ধরতাম—সেটা একটু বলবেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "যা হয়নি তা বলে লাভ কী! সুযোগ-সুবিধে বুঝে মতলব ঠিক করতে হয়। আসল মহাদেবই আমাদের যেরকম শিক্ষা দিল, তাতে নকল মহাদেবকে কাজে লাগাবার ভাবনাই ভাবতে পারলাম না।... যাকগে, মহাদেব চাইছিল আপনি কলকাতায় ফিরে যান। সে আপনাকে তিনদিনের সময় দিয়েছিল। একটা দিন দেরি হয়ে গেছে বোধহয়। তাতে কিছু হবে না। আপনি তো ফিরেই যাচ্ছেন। মহাদেব খুশি হবে। মনে হয় না, সে আর আপনার সঙ্গে কোনো শত্রুতা করবে।" বলে উঠে পড়লেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল, "কাল আপনারা, আপনি আর সতীশবাবু মহাদেবকে কিসের ওষুধ খাওয়ানোর কথা বলছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর চেয়ার সরিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আপনি যাতে নিরাপদে চলে যেতে পারেন তাই আপনার যাবার সময় ওকে একটু ঘুম পাড়িয়ে রাখার কথা হচ্ছিল।" বলে সিদ্ধেশ্বর দরজার দিকে পা বাড়ালেন, "দুর্জনকে বিশ্বাস করা যায় না, কী বলেন?"

বরদা বিছানা থেকে নেমে আসছিল; সিদ্ধেশ্বর দরজা পেরিয়ে হঠাৎ মুখ ফেরালেন। তাঁর যেন কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল। বললেন, "আপনার সঙ্গে তো মাল কিছুই নেই। সুটকেশ সামলে মোটর-বাইকে যেতে পারবেন না। ওটা আগেই দিয়ে দেবেন। স্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। গোপাল নিয়ে যাবে।"

"যাবে কেমন করে?"

"সে ভাবনা আমাদের। সাইকেল নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে যাবে, সেখান থেকে বাস ধরবে। তবে বিকেল নাগাদ দিয়ে দেবেন সুটকেস। নয়ত সময়-মতন পৌঁছতে পারবে না।"

বরদা সুটকেসের কথা আগে ভাবেনি। সত্যিই সুটকেস সামলে মোটর-বাইকের পেছনে বসে রামপুরহাট পর্যন্ত যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

বরদা উঠল। বেলা হয়ে গিয়েছে। স্নান-খাওয়া করতে হবে।

দুপুরে আর বরদার ঘুম হল না। গড়িয়ে গড়িয়ে কাটাল। কাল সে কলকাতায় নিজের বাড়িতে এতক্ষণ গড়াগড়ি করছে। বিকেলেই বেরিয়ে পড়বে মানিকের খোঁজে। মানিককে সব বলতে হবে, এখানকার কথা।

সিদ্ধেশ্বরকে আজ কেমন গম্ভীর, ক্ষুব্ধ মনে হল। বরদা চলে যাচ্ছে বলেই হয়ত। তিনি নিশ্চয় অনেক কিছুই ভেবে-ছিলেন। কোনোটাই কাজে এল না। বরদার কোনো দোষ নেই। সে জেদাজেদি করে চলে যাচ্ছে বলে সিদ্ধেশ্বরের রাগ হলেও বরদার কিছু করার নেই। এখানকার ঝঞ্ঝাট যদি মামুলি হত, বরদা সাহায্য করতে পারত সিদ্ধেশ্বরকে। কিন্তু তা যখন নয়, ব্যাপারটা খুনোখুনির মধ্যে গিয়ে পড়েছে, কিছুই করতে পারবে না বরদা। নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না।

দশ রকম ভাবতে ভাবতে বিকেল হল। বরদা উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। গোছগাছ প্রায় সেরেই রেখেছে, সামান্য যা বাকি আছে সেরে নেবে।

হাত-মুখ ধুয়ে আসতে গেল বরদা। ধুয়ে এসে জামাকাপড় পালটে ফেলবে। গোপাল আসবে সুটকেস নিতে। আর গড়িমসি না করাই ভাল।

একেবারে শেষ বিকেলে সিদ্ধেশ্বর এলেন। বললেন, "আপনার খাবার-দাবার একটা টিফিন কেরিয়ারে করে গোপালকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময়-মতন ও আপনার সুটকেস, রাত্রের খাবার আর ট্রেনের টিকিট নিয়ে স্টেশনে হাজির থাকবে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। সতীশ একটু পরেই আসছে।"

"আপনি?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"আমি যতটা পারি এগিয়ে থাকছি। ঝাড়িখাস বলে একটা জায়গা আছে, ওখানেই থাকব। ওখান থেকেই বিদায় জানাব আপনাকে।"

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন। কিন্তু আমার অবস্থাটা যদি আপনি বুঝতেন—"

বরদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "না না, রাগ করব কেন? আমার নিজেরই ভুল হয়েছিল। যাক্ গে, ও-সব আর ভাববেন না; যাবার সময় হয়ে এসেছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি যাই।"

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

বরদার তৈরি হওয়ার কিছু ছিল না। সে সাজগোজ সেরেই বসে ছিল। যাবার সময় চুলটা একবার আঁচড়ে নেবে, রুমালে মুখ মুছবে; জুতোটা পায়ে গলিয়ে ফিতে বাঁধবে, আর কী!

একটা সিগারেট ধরিয়ে বরদা অপেক্ষা করতে লাগল সতীশের।

আলোর ফিকে ভাবটুকু দেখতে-দেখতে মুছে গেল কখন। অন্ধকার হয়ে গেল। আবার অন্ধকারের মধ্যে হালকা জ্যোৎস্না ফুটে উঠল ক্রমশ।

সতীশই দৌড় করে এল। ডাকল, "আসুন।"

বরদা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। "দেরি হয়ে গেল না?"

"হল একটু। গাড়িটা গণ্ডগোল করছিল। ঠিক করে নিলাম।"

"পৌঁছতে পারব তো?"

"বলেন কী! কতক্ষণ আর লাগবে। হাই স্পীডে বেরিয়ে যাব। আসুন।"

বরদা সতীশের মোটর-বাইকের পেছনে গিয়ে বসল। বলল, "আমার কিন্তু অভ্যেস নেই। আনাড়ি। জোরে যাবেন না।"

সতীশ হাসল। বলল, "ভাল করে ধরে বসুন। এ-সব রাস্তা ভাল নয়। মাঝে-মাঝে লাফাবে।"

স্টার্ট দিল সতীশ। বরদা সতীশকে আঁকড়ে ধরল।

ছোট একটা পাক খেয়ে গাড়ি ফটকের কাছে। মালি ফটক খুলে দিল। একেবারে মাঠে গিয়ে পড়ল মোটর-বাইক।

বরদা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। জায়গাটা তার ভালই লেগেছিল, কিন্তু বড় গোলমেলে ব্যাপার এখানে, মনের স্বস্তি-শান্তি নিয়ে থাকা যায় না। ওপর-ওপর কেমন শান্ত, নিরিবিলি, আশ্রম-আশ্রম মতন, অথচ ভেতরে কী ভয়ংকর!

মোটর-বাইকের শব্দটা প্রথম দিকে কানে লাগছিল। এখন আর লাগছে না। বোধহয় ফাঁকা মাঠেঘাটে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। সন্ধে হয়ে গেছে। আসবার দিন বরদা যে-রকম চাঁদের আলো দেখেছিল, তার চেয়েও খানিকটা যেন স্পষ্ট আলো দেখছে আজ। শীত না থাক, আমেজটা রয়েছে। গাছপালা কালচে। চাঁদের আলো যেন জলের ঝাপটার মতন গায়ে মাথায় লেগে আছে।

হেডলাইট জ্বালানোই ছিল। সতীশ তেমন জোরে যাচ্ছে না। গাড়িটা মাঝেই-মাঝেই লাফাচ্ছিল।

যেতে যেতে দু-একটা কথা বলল সতীশ। বাতাসে শোনা যায় না। বরদা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে জবাব দিল। তার মনে এখনও খানিকটা উদ্বেগ রয়েছে। মনে হয় না ভয়ের কিছু আছে, তবু বরদা একেবারে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

সতীশ গাড়ি জোর করল। আলোটা তীরের ফলার মতন সামনের দিকে ছুটছে। আশপাশ নিঃসাড়। মাঝে-মাঝেই ঝোপঝাড় যেন ছুটে এসে রাস্তা আগলে দাঁড়াতে চাইছে, আবার সরে যাচ্ছে। কোথাও বা ফাঁকা মাঠ। উঁচু-নিচু। জ্যোৎস্নার মধ্যে শুয়ে আছে। বিশাল কোনো নিম বা কাঁঠালগাছ কিংবা অন্য কিছু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

পলাশ-বন এসে গেল। এদিকে যেন আরও পরিষ্কার জ্যোৎস্না। বরদার মনে হল, এই রকম কোনো একটা জায়গায় সিদ্ধেশ্বরের থাকার কথা। মানুষটি বড় অদ্ভুত। বরদাকে উনি কাজে লাগাতে এনেছিলেন। পারলেন না। একটু যেন দুঃখই হল বরদার।

হঠাৎ সতীশ যেন কী বলল।

বরদা শুনতে পেল না।

গাড়িটা যেতে-যেতে ধীরে হয়ে আসছিল, তার শব্দ বন্ধ হল, তারপর গড়িয়ে-গড়িয়ে সামান্য এগিয়ে থেমে গেল।

"কী হল?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"বুঝতে পারছি না। নামুন। দেখছি কী হল।"

বরদা নামল। সতীশও নেমে পড়ে গাড়িটাকে স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করাল। তার টুল-বক্সে যন্ত্রপাতি টর্চ রয়েছে। গাড়ির আলো নিবিয়ে দিল সতীশ। টুল-বক্স থেকে টর্চ বার করল।

বরদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এ-ভাবে মোটর-বাইক বিগড়ে যাওয়ায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। উদ্বেগও বোধ করছিল।

সতীশ কখনও ঝুঁকে পড়ে, কখনও উবু হয়ে বসে কী-সব দেখছিল। দেখতে-দেখতে নিজের মনে যেন কিছু বলল।

আর ঠিক সেই সময় বরদা সামান্য দূরে কার পায়ের শব্দে চমকে উঠে তাকাল। তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

আবার সেই শ্যাম

অশোক দাশগুপ্ত

মোহনবাগান যে লীগ পাবে, ৬ আগস্টের বিকেলেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার খেলায় কে নায়কের ভূমিকা নেবে, খেলা শুরু হবার আগে তা কারও জানা ছিল না। খেলা শুরু হতেই বোঝা গেল, সেই লোকটি শ্যাম থাপা।

কেউ কিছু চাইলে, পারলে তা দিতে হয়। উনিশশো পঁচাত্তরে তৃতীয় বার কলকাতায় আসার পরই শ্যাম থাপার সঙ্গে আমার দোস্তি। এ পর্যন্ত ছ'বার শ্যামের কাছে একটা জিনিসই চেয়েছি। চারবার ও তা দিয়েছে। বাকি দু'বার না পেরে দুঃখে মাথা নেড়েছে।

শিশুর মতো সরল আর ছটফটে শ্যাম থাপাকে প্রতিটি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের আগেই বলেছি,—"শ্যাম, একটা গোল চাই।"

ছিয়াত্তরের লীগ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এবং সাতাত্তরের লীগ ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে শ্যাম গোল পায়নি। বাকি চারবার কথা রেখেছে। একবার তো (পঁচাত্তরের শীল্ড ফাইনালে) সঙ্গে ফাউ ছিল এক গোল।

এবারও খেলার আগের দিন সকালে মোহনবাগান টেন্টে যেতেই শ্যাম একধারে ডেকে এনে বলল, "কী, গোল করতে হবে, এই তো? ট্রাই করব।"

আমি তখনও ওর হাত ধরে আছি। আশেপাশেই বসে আছে মোহনবাগানের আর-সব ফুটবলার। বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শ্যাম বলল, "সেভেন্টি মিনিটস খেললে গোল করব, যদি লাক ফেভার করে।"

খেলার পর দিন সকালে ওর বাড়ি যেতেই শ্যাম এমনভাবে আমার হাত চেপে ধরল যে, মনে হল গোলটা যেন আমিই করেছি।

খেলা শুরুর সময় আমাদের সকলের চোখ অনেকখানি ছিল মহারাষ্ট্রের ভয়ংকর স্ট্রাইকার সাবির আলির ওপর। এত নজর দিলে কেউ খেলতে পারে! খেলার পর সাবির জানাল, এখানে ওর মানিয়ে নিতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু সব ঠিক হয়ে যাবেই।

খেলা শুরুর আগে তোমাদের প্রিয় ফুটবলারদের কান্ড যদি দেখতে! যারা দেখেছ, তারাও তো সবটা দেখনি। কোন টীমই আগে মাঠে নামবে না, পরে মাঠে-নামা টীমই নাকি জিতে যায়। মন্ত্রী বিফল, বড়-বড় নেতা বিফল, পুলিসের বড়কর্তারা হিমশিম। শেষে তো কিছু দর্শক চিৎকার করে পুলিসকে উপদেশই দিয়ে দিলেন, "বাইশজন প্লেয়ারকেই অ্যারেস্ট করে মাঠে ঢুকিয়ে ছেড়ে দাও!"

শেষ পর্যন্ত তা আর করতে হয়নি, একসঙ্গে মাঠে নেমেছে প্রসূন আর সুরজিৎ, মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল।

খেলার শুরুতেই প্রদীপ চৌধুরীর এক জবরদস্ত ট্যাকল সাবিরকে বুঝিয়ে দিল, ব্যাপারটা খুব সোজা হবে না। ওদিকে

লীগে মুখোমুখি, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফোটো তপন দাশ

শ্যামের সেই বিখ্যাত ব্যাক-ভলি ফোটো অলক মিত্র

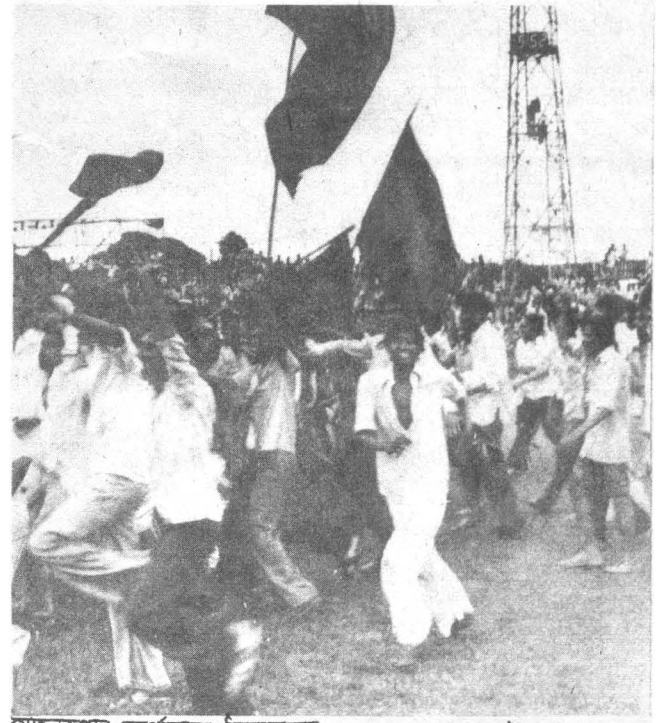

মোহনবাগান সমর্থকদের বিজয়োল্লাস ফোটো সন্তোষ ঘোষ

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

By SCHOLARS

প্রশ্নোত্তরে

মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান

(Based on Guide Line published in পর্ষদ বার্তা by the West-Bengal Board of Secondary Education)

To be had of

LEKHA PARA
18B, Shyamacharan Dey Street
Calcutta-700073

PEOPLE'S CORNER
10, Shyamacharan Dey Street
Calcutta-700073

পরীক্ষার ফল / নির্ভর করে ভাল পুস্তক নির্বাচনের উপর

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

By Teachers

১ মাধ্যমিক প্রাণবিজ্ঞান সহায়িকা
২ মাধ্যমিক জড়বিজ্ঞান সহায়িকা
৩ মাধ্যমিক সংস্কৃত সহায়িকা
৪ মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
৫ মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
৬ মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
৭ HELPS TO THE STUDY OF SECONDARY ENGLISH

উপরোক্ত Help Books গুলি

BASED ON GUIDE LINE PUBLISHED IN 'পর্ষদবার্তা' BY THE WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (MONTHLY BASIS)

1. বইগুলি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 'পর্ষদ বার্তা'(GUIDE LINE) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে, অর্থাৎ (a) OBJECTIVE TYPE, (b) ESSAY TYPE, (c) SHORT ANSWER TYPE, (d) ORAL TEST এই চারিপ্রকার QUESTIONS যথাযথভাবে নির্বাচন করা হয়েছে,
2. প্রথমেই বলতে হয় বইগুলি প্রচুর চিত্রসমৃদ্ধ, তাই একাধারে "TEXT BOOK ও HELP BOOK" যে জন্য প্রতিটি পরীক্ষার্থীর কাছে ইহা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হবে,
3. মাধ্যমিক শিক্ষকগণ নতুন SYLLABUS অনুসরণ করতে গিয়ে এবং দৈনন্দিন CLASS-এ পড়াতে গিয়ে যে যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে,
4. নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাসভুক্ত সমস্ত বিষয় (SUBJECT) বিশদভাবে অন্তর্ভুক্ত,
5. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তথ্যসম্পূর্ণ,
6. উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ,
7. অধ্যায় শেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর বিভাগ ADDITIONAL QUESTIONS & HINTS অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে,

ALLIED BOOK AGENCY
18/A, SHYAMA CHARAN DEY STREET • CALCUTTA-73

মনোরঞ্জনও দাপটে মাথা এবং পা চালিয়ে জানিয়ে দিল : আমিও কিছু কম যাই না।

সুভাষ আর বিদেশ ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। চিন্ময় আর সত্যজিৎ ঝড়ের মুখে উড়ে গেল না। চিন্ময় খুব খুশি, বন্ধু বিদেশকে এবার রুখে দিয়েছে। এবার বিদেশকে রাখার উপায় জানতে চিন্ময় গিয়েছিল সুধীর কর্মকারের বাড়ি। সুধীর পিঠে হাত রেখে বুঝিয়ে দিয়েছে, কীভাবে বিদেশকে আটকাতে হবে।

সত্যজিৎও সুভাষকে ছেড়ে কথা বলেনি। অবশ্য বহুক্ষণ তাকে-তাকে থেকে একবার সত্যজিৎকে ফাঁকি দিয়েই কাজের কাজ করে গেছে সুভাষ।

মাঝ মাঠের লড়াই হল আসল ব্যাপার। প্রসূন রাজসিক চলাফেরায় বুঝিয়ে গেল---"আমি মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন।" পিন্টু চৌধুরীও বোধ হয় মাঝেমধ্যে মনে করাতে চাইল "গতবার দ্বিতীয় গোলটি আমিই করেছিলাম।" গৌতম সারা মাঠ জুড়ে একটি পতাকাই দুলিয়ে গেল- "আমি গৌতম সরকার, মধ্যমাঠের রাজা।" আর প্রশান্ত ব্যানার্জি ? অনেক উপেক্ষার জবাব ছিল ওর বুটের ডগায়, প্রতিটি পদক্ষেপে।

সুরজিৎ আর উলাগা মাঝেমধ্যে সত্যিই খেলা তৈরি করেছে। কিন্তু সুব্রত ভট্টাচার্য সাবিরের দায়িত্ব এমনভাবেই নিয়েছিল যে, মিহিরের দিকেই দুই উইঙ্গার তাকিয়ে ছিল। মিহিরের ঘাড়ে সম্ভবত ঝুলছিল 'রিপ্লেসমেন্ট নোটিশ', খুব ভাল না খেললেই তপন আসবে। শ্যামল ব্যানার্জি আর দিলীপ পালিত যতই লড়ুক, সুরজিৎ আর উলাগা কিন্তু বেশ কয়েকবার ঢুকে পড়েছে।

সুভাষ আর বিদেশ যদি বা কিছু খেলে থাকে, মাঝের দুই স্টার হাবিব আর শ্যাম জ্বলছিল মিটমিট করে। সুভাষের ঐ দুর্দান্ত সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে হাবিব একবারই কিছু আলো এনেছিল। আর ঐ বলেই অলৌকিক ব্যাক ভলি মেরে পড়ন্ত বিকেলে সূর্য ওঠাল শ্যাম, যে গোল করতে বড্ড ভালবাসে।

সুব্রত ভট্টাচার্য যেমন সাবিরকে উঁচু বল ছুঁতে দেয়নি, শ্যাম থাপাও পারেনি মনোরঞ্জনকে টপকাতে। দুই স্বাস্থ্যবান স্টপার ওপরের দিকে দাপটে রাজত্ব করেছে। মাঝেমধ্যে সুব্রত বা মনোরঞ্জনের কড়া ওষুধ দর্শকদের ভাল লাগেনি। কিন্তু খেলা শেষে সাবির জানিয়েছে, সুব্রত দারুণ ফুটবল খেলেছে। আর শ্যাম থাপা তো খোলাখুলি বলেছে, "মনোরঞ্জন খুব ভাল স্টপার।" স্টপারকে তো এরকমই হতে হবে।

খেলা শেষে মোহনবাগান টেন্টে স্বভাবতই হৈ-হুল্লোড়। ইস্টবেঙ্গল টেন্টে শোকের হাওয়া। সুসময়ের ভিড়ে না মিশে ঐ শোকের হাওয়াই গায়ে লাগালাম। একে-একে বাড়ি ফিরল ইস্টবেঙ্গলের ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ফুটবলাররা। হঠাৎ কিছু উগ্র সমর্থকদের ছোঁড়া ইঁটের আঘাতে একটা গাড়ির কাঁচ চৌচির, মাথা ফাটল অতিরিক্ত ফরোয়ার্ড রঞ্জিত মুখার্জির। গাড়ি থেকে পিন্টু চৌধুরী আর ভাস্কর গাঙ্গুলি নেমে আসতেই অবশ্য বীরপুরুষরা উধাও।

এই বড় ম্যাচ যারা দেখেছে, তারা হয়ত শ্যামের ব্যাকভলি বা সুব্রতর অনবদ্য হেডওয়ার্ক মনে রাখবে। কিন্তু খেলার আগের এবং পরের দুটি ঘটনা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

যদি ফুটবলার হও, কখনও কুসংস্কারের চাকর হয়ে মাঠের বাইরে পঞ্চাশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে অপমান ও দর্শকদের বিরক্ত কোরো না। আর যদি নেহাতই দর্শক হও, কখনও খেলোয়াড়ের মাথায় ইঁট মেরে বীরত্ব দেখিও না।

শীল্ডের পঁচাশি পূর্ণ হল

মুকুল দত্ত

আই এফ এ শীল্ডের বয়স এবার পঁচাশি বছর পূর্ণ হল। প্রতিযোগিতা হচ্ছে কিন্তু ছিয়াশিতম। শুরু হয়েছিল ১৮৯৩ সনে। শুরু মানে তো খেলা নিয়েই শুরু। এক বছর পূর্ণ হবার পর হয়েছে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা। তাই বয়সের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সংখ্যা এক বেড়ে যায়, অঙ্কের নিয়মে।

তোমরা যারা ছোট, তারা বাবা-কাকার কাছে এই আই এফ এ শীল্ডের খেলার কত কথাই হয়তো শুনেছ। ঠাকুরদার কাছে হয়তো শুনেছ আগের দিনের জাঁদরেল ব্রিটিশ মিলিটারি দলগুলির খেলার কত গল্প। রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস, গ্লস্টারশায়ার রেজিমেণ্ট, নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার, ব্ল্যাকওয়াচ, ইস্ট ইয়র্কশায়ার, ডারহামস, শেরউড ফরেস্টার, স্রপশায়ার প্রভৃতি পল্টন দলগুলি কী দারুণ খেলত। কলকাতার সাহেব ও বাঙালি দলগুলির সঙ্গে তাদের কী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হত। এই সব কথা।

দেশ ভাগের পর যাদের ঠাকুরদা বা বাবা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে ঘর বেঁধেছেন, তারাও হয়তো এই শীল্ডের কত গল্প শুনেছে। আগে এই শীল্ডের খেলা ছিল সারা বাংলা এবং সারা ভারতের বড় খেলার মেলা। বাংলার প্রায় প্রতি জেলার দল খেলতে আসত। আসত ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল কুমিল্লা, খুলনার দল। আসত হবিগঞ্জের দল, চাঁদপুরের দল। হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা-দল তো এখনো আসছে। আগেও আসত। প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে এই সব জেলা-দলের খেলা হত গড়ের মাঠের নানা গ্রাউণ্ডে। মনে হত এক-একটি জেলার মানুষ এক-একটি মাঠ দখল করে নিয়েছেন। কারণ কলকাতায় তো সব জেলারই প্রচুর মানুষের বাস। যে যাঁর নিজের জেলার দলের খেলা দেখার জন্য গড়ের মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। আগে শীল্ডের সব খেলাই হত কলকাতায়। এখন তো ক'বছর থেকে প্রথম পর্যায়ের খেলা হচ্ছে এক-একটি অঞ্চলে—কৃষ্ণনগর, খড়্গপুর, দুর্গাপুর, বার্নপুরে। ওই সব অঞ্চলের বিজয়ীদের সঙ্গে নামী দলগুলিকে নিয়ে মূল খেলা হচ্ছে কলকাতায়।

পঁচাশি বছর আগে যে-বার আই এফ এ শীল্ডের খেলা প্রথম শুরু হয়, সে-বারও কিন্তু শুধু কলকাতায় খেলা হয়নি। হয়েছিল ভারতের দুটি অঞ্চলে—এলাহাবাদে এবং কলকাতায়। ফাইনাল খেলা অবশ্য কলকাতাতেই হয়—দুই অঞ্চলের বিজয়ীর মধ্যে।

কেন দুই অঞ্চলে খেলা হয়েছিল, কেনই বা নাম হয়েছিল আই এফ এ শীল্ড জানো? তখন তো আমরা ছিলাম ব্রিটিশের শাসনে। কোনো ইংরেজ রাজপুরুষের নামে বা ভারতের কোনো রাজা-মহারাজার নামে শীল্ডের নামকরণ না করে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নামে শীল্ড করা হয় ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে।

ইংল্যাণ্ডের ফুটবল সংস্থার নাম "ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন"। অর্থাৎ এফ এ। ১৮৬৩ সনে এই এফ এ-র সৃষ্টি। আর এফ এ কাপের খেলা শুরু হয় ১৮৭১ সন থেকে। আমাদের আই এফ এ এবং আই এফ এ শীল্ডের সৃষ্টি ১৮৯৪ সনে—এফ এ কাপের মাত্র বাইশ বছর পরে।

আই এফ এ শীল্ড কিন্তু আমাদের প্রথম প্রতিযোগিতা নয়। প্রথম প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপের খেলা, শীল্ডের চার বছর আগে, ১৮৮৯ সনে যার সূচনা। তারও আগে দিল্লিতে ১৮৮৮ সনে শুরু হয় ডুরাণ্ড কাপের খেলা। জানোই তো

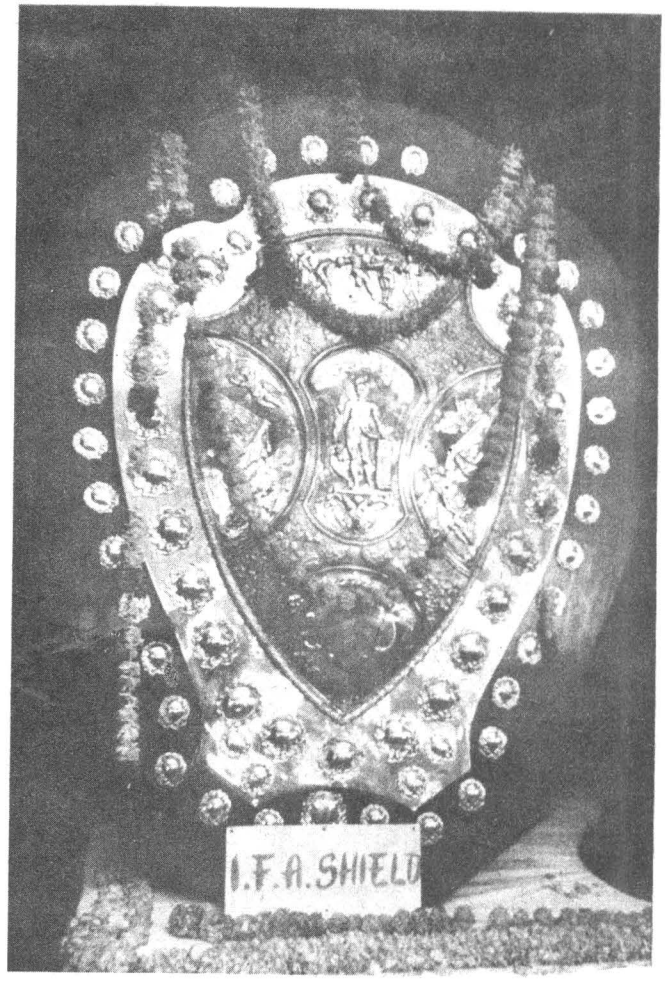

ডুরাণ্ড ছিল শুধু ব্রিটিশ সামরিক দলগুলির প্রতিযোগিতা। অন্য কোনো দল ডুরাণ্ডে খেলতে পারত না। ট্রেডস কাপ কিন্তু ছিল খোলা প্রতিযোগিতা। সামরিক দলও খেলতে পারত, অসামরিক দলও খেলতে পারত। তবে শক্তিশালী ব্রিটিশ সামরিক দলগুলির নজর ছিল ডুরাণ্ডের দিকে। তাই যাতে ভারতের নানা কেন্দ্রের মিলিটারি দলগুলি খেলায় যোগ দেয় এবং সর্বভারতীয় প্রথায় প্রতিযোগিতার মর্যাদা বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে প্রথম বছর আই এফ এ শীল্ডের খেলার ব্যবস্থা হয় এলাহাবাদে ও কলকাতায়। ওই একবারই। তারপর প্রতি বছরই খেলা হয়েছে কলকাতায়। প্রথম তিন-চার বছর কিন্তু আই এফ এ শীল্ড ও ট্রেডস কাপের প্রায় সমান জলুষ ছিল। ১৮৯৭ সালে ট্রেডস কাপ জুনিয়র প্রতিযোগিতায় পরিণত হবার পর আরম্ভ হয় শীল্ডের খেলার রমরমা। বোধহয় জানো, ওই সময় থেকেই এই নিয়মটা চালু হয় যে, যে খেলোয়াড় আই এফ এ শীল্ডে খেলে, সে ট্রেডস কাপে খেলতে পারে না, সিনিয়র খেলোয়াড় হয়ে যায় বলে।

যাই হোক প্রথম বছর কলকাতা অঞ্চলে নয়টি এবং এলাহাবাদ অঞ্চলে পাঁচটি দল শীল্ড খেলার জন্য নাম দিলেও শেষ পর্যন্ত খেলা হয় বারোটি দলের মধ্যে। এলাহাবাদ অঞ্চলের

খেলা থেকে নাম তুলে নিয়ে দুই সামরিক দল আর্গিল ও সাদারল্যান্ড ডুরান্ড কাপ খেলতে চলে যায়। ওই অঞ্চলে ইস্ট ল্যাংকাশায়ার ৬—০ গোলে হারায় অক্সফোর্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রিকে। ইস্ট ল্যাংকাশায়ারকে আবার ৫—০ গোলে হারিয়ে রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস ফাইনাল খেলতে আসে কলকাতায়।

কলকাতা অঞ্চলে যে নয়টি দল খেলেছিল, তাদের নাম - ডালহৌসী, রয়্যাল সাসেক্স, পঞ্চম রয়্যাল আর্টিলারি, হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাব, রাইফেল ব্রিগেড, ক্যালকাটা, ২৩ রয়্যাল আর্টিলারি, নাভাল ভলেণ্টিয়ার্স ও শোভাবাজার।

দেখতেই পাচ্ছ, এলাহাবাদ অঞ্চলে সব ছিল ব্রিটিশ পল্টন দল। কলকাতা অঞ্চলেরও নয়টির মধ্যে চারটি। একমাত্র ভারতীয় দল ছিল শোভাবাজার ক্লাব। হাওড়া ইউনাইটেড তখন ছিল ইউরোপের খেলোয়াড়দের দল। আর এখনকার মেসার্সার্স ক্লাবেরই আগে নাম ছিল নাভাল ভলেণ্টিয়ার্স। ফুটবলের কতগুলি প্রথম ঘটনার সঙ্গে শোভাবাজারের নাম যুক্ত হয়েছে প্রথম শীল্ডে খেলার সুবাদে। যেমন- কলকাতার প্রথম ফুটবল ক্লাব ডালহৌসী (১৮৭৮), প্রথম প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপ (১৮৮৯), প্রথম হ্যাটট্রিক ট্রেডস কাপে শোভাবাজারের বিরুদ্ধে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের নরম্যান প্রিচার্ডের (১৮৮৯), প্রথম কোন ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ সামরিক দলের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জয় শোভাবাজারের। প্রতিযোগিতা জয়ের প্রথম হ্যাটট্রিক মোহনবাগানের (১৯০৬ থেকে ১৯০৮ ট্রেডস কাপ)। উল্লেখ করা যেতে পারে, পর পর তিন বছর ট্রেডস কাপ জেতার পর মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ডে খেলার অধিকার পায় এবং প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ১৯১১ সালে শীল্ড জিতে এ-দেশের ফুটবলে নতুন যুগের সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, আগে লিখতে ভুলে গেছি, প্রথম বছরের শীল্ডে শোভাবাজার ৩—০ গোলে হেরে গিয়েছিল পঞ্চম রয়্যাল আর্টিলারির কাছে। রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস ফাইনালে ১—০ গোলে পঞ্চম রয়্যাল আর্টিলারিকে হারিয়ে শীল্ড জিতেছিল। ২রা সেপ্টেম্বর প্রথম দিনের ফাইনাল ১—১ গোলে অমীমাংসিত ছিল। ৬ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দিন আর্টিলারি হেরেছিল ভাগ্য একটু মন্দ ছিল বলে। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে রয়্যাল আইরিশের ওয়েবস্টার একটি বল সেণ্টার করলে আর্টিলারির ব্যাক স্পিণ্ডলে বলটি আটকাতে পারলেন না। গোলকীপার হকসওয়েল গোল ছেড়ে এগিয়ে গেলেন বল ধরতে। কিন্তু পিছল মাঠে পা ফসকে পড়ে গেলেন। মাঠ থেকে উঠতে উঠতে দেখলেন ফ্রাহার ফাঁকা গোলে বল ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ১৮৯৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের স্টেটসম্যান পত্রিকা যদি খুঁজে পাও, গোলের এই বিবরণ দেখতে পাবে। ওই কাগজেই দেখতে পাবে ফাইনালে ডালহৌসী মাঠে হাজার দশেক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আর খেলার আগে সকাল থেকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল।

একটি কথা আমি ভুল লিখেছি। লিখেছি ১৮৯৩ সনে আই এফ এ শীল্ডের সৃষ্টি। আসলে শীল্ডের খেলা শুরু। বিলেত থেকে শীল্ডটি কলকাতায় না পৌঁছনোর ফলে প্রথম বছর রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস দল কিন্তু হাতে শীল্ড পায়নি, যেমন দু বছর ধরে ফেডারেশন কাপের খেলা চলছে, কিন্তু এখনো কাপটি তৈরি হয়নি। তবে খালি হাতেও ফিরতে হয়নি রয়্যাল আইরিশের খেলোয়াড়দের। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম নামে এক সামরিক অফিসার বিজয়ী খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন নীল রংয়ের ফিতেয় বাঁধা একটি করে মেডেল। নীল ফিতে ইংরেজদের কাছে মস্ত সম্মানের চিহ্ন।

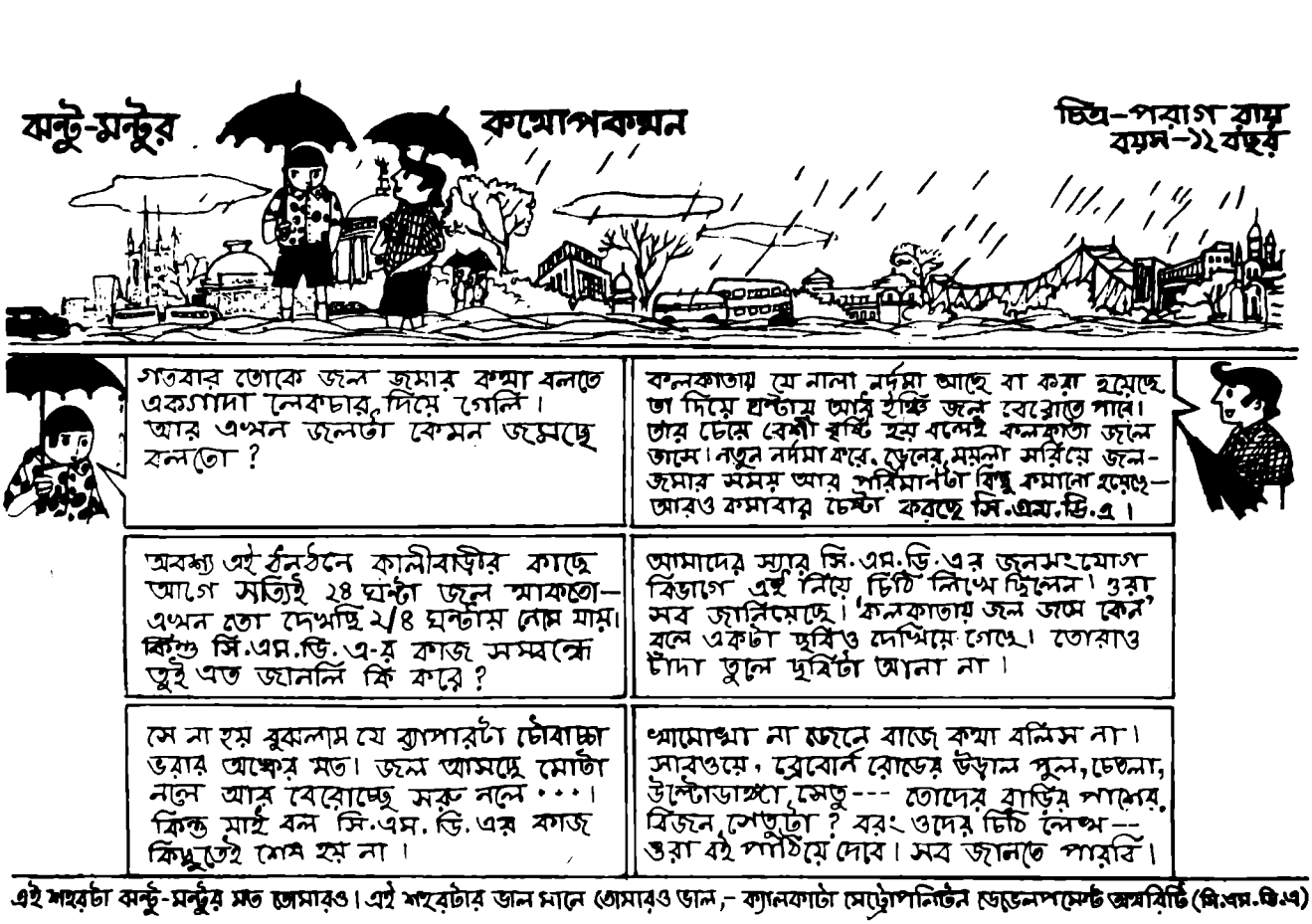

ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপর্যয়

পুষ্পেন সরকার

বার্মিংহামের এজবাস্টন মাঠে তখন ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে। আবহাওয়া ভাল। কালো মেঘের আনাগোনা নেই। রোদের ঝিলিক দিচ্ছে মাঠে।

পাকিস্তান ব্যাট করছে। বল করছেন উইলিস, ক্রিস ওল্ড, এডমণ্ডস, মিলার প্রভৃতি দুদে বোলার। পাকিস্তানের ব্যাটস-ম্যানদের আউট করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁরা। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি বেশ ভেবেচিন্তে বোলার বদল করছেন। পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা সাহস নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মধ্যাহ্নভোজের সময়ে পাকিস্তানের দুই উইকেটে ৮৫। একটা বড় ইনিংস গড়ার ইঙ্গিত।

লাঞ্চের টেবিলে ব্রিয়ারলি ২৯ বছর বয়স্ক অভিজ্ঞ বোলার ওল্ডের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ওল্ড অধিনায়ককে বললেন, "চিন্তা করবেন না। দেখা যাক কী করতে পারি।"

মধ্যাহ্নভোজের পর খেলা শুরু হল। পাকিস্তানের ইনিংস ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে বোলিং শুরু করলেন ওল্ড। বল যেন আগুনে গোলার মতো তাঁর হাত থেকে বের হয়ে আসতে লাগল। প্রতিটি বলের প্রকৃতি আলাদা।

পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্ত করে দিল ওল্ডের বলগুলি। উইকেট পড়তে থাকল ঝরা পাতার মতো। পাঁচ বলে পাকিস্তানের বাঘা-বাঘা চারজন ব্যাটসম্যান কুপোকাত। বড় ইনিংস গড়ার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দলের খেলো-য়াড়রা এসে ওল্ডকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্রিয়ারলি বললেন, "সাবাস, তুমি তোমার কথা রেখেছ।"

টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে পাঁচ বলে চার উইকেট নেবার নজির একটি মাত্র ছিল। ইংল্যাণ্ডের এম জে সি অ্যালম ৪৯ বছর আগে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। দিনের শেষে পাকিস্তানের ৯ উইকেটে ১৬২। ওল্ডের জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং ২২.৪ ওভার, ৭ মেডেন ৫০ রান, ৭ উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই পাকিস্তানের ইনিংসের যবনিকা পড়ল মাত্র ২ রান যোগ হবার পর। এরপর ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিংয়ের পালা। পিচ ব্যাটসম্যানদের অনুকূল। তৃতীয় দিনে চায়ের বিরতিতে ৮ উইকেটে ৪৫১ রান তুলে ব্রিয়ারলি ইংল্যাণ্ডের ইনিংস ঘোষণা করে দিলেন। র‍্যাডলে (১০৬) ও বথহাম (১০০) সেঞ্চুরি করলেন। বথহামের নির্ভুল ব্যাটিং দেখে সমালোচকরা মন্তব্য করলেন : "গ্রেগের যোগ্য উত্তরাধিকারী।"

২৮৭ রান পিছিয়ে থেকে পাকিস্তান ইনিংস পরাজয় এড়াতে অনেক চেষ্টা করেছিল। বিশেষ করে জোর লড়ে-গিয়েছিলেন দলের পতন রোধ করতে সাদিক মহম্মদ (৭৯)। কিন্তু তাঁর একক চেষ্টায় কী আর হবে! ২৩১ রানে পাকি-স্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। ইংল্যাণ্ড প্রথম টেস্টে জিতল এক ইনিংস ও ৫৭ রানে। চতুর্থ দিনের চা-বিরতির পরেই জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল।

সেই চতুর্থ দিনের শুরুতেই এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। তৃতীয় দিনের শেষে পাকিস্তানের সংগ্রহ ছিল এক উইকেটে ৯৫ রান। সাদিক মহম্মদের সঙ্গে দিনের শেষ দিকে 'নাইট ওয়াচম্যান' হিসাবে ব্যাট করতে এসেছিলেন বোলার ইকবাল কাসিম। চতুর্থ দিনের প্রথম থেকেই ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলাররা পাকিস্তানের ইনিংস শেষ করে দিতে তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকলেন। কিন্তু কাসিম প্রায় এক ঘণ্টা উইকেট কামড়ে পড়ে থাকেন। শেষে উইলিস এক জোরালো বাম্পার ছাড়লেন। কাসিম লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। রক্তে ভেসে গেল মুখ। কাসিমের ঠোঁটে দু-তিনটে সেলাই দিতে হল।

ক্রিকেট খেলার অনেক আইন আছে। আবার এমন কিছু অলিখিত শালীনতা আছে, যেগুলি আইন হিসাবে লিপিবদ্ধ না-থাকলেও মেনে চলা হয়। যারা ব্যাটসম্যান নয় তাদের বিরুদ্ধে বাম্পার না দেওয়া হল এই অলিখিত আইনের একটি। ইংল্যাণ্ডের বোলার উইলিস কিন্তু আইন মানলেন না।

ব্যাপারটি নিয়ে ক্রিকেট সমালোচকরা নানা মন্তব্য করেছেন।

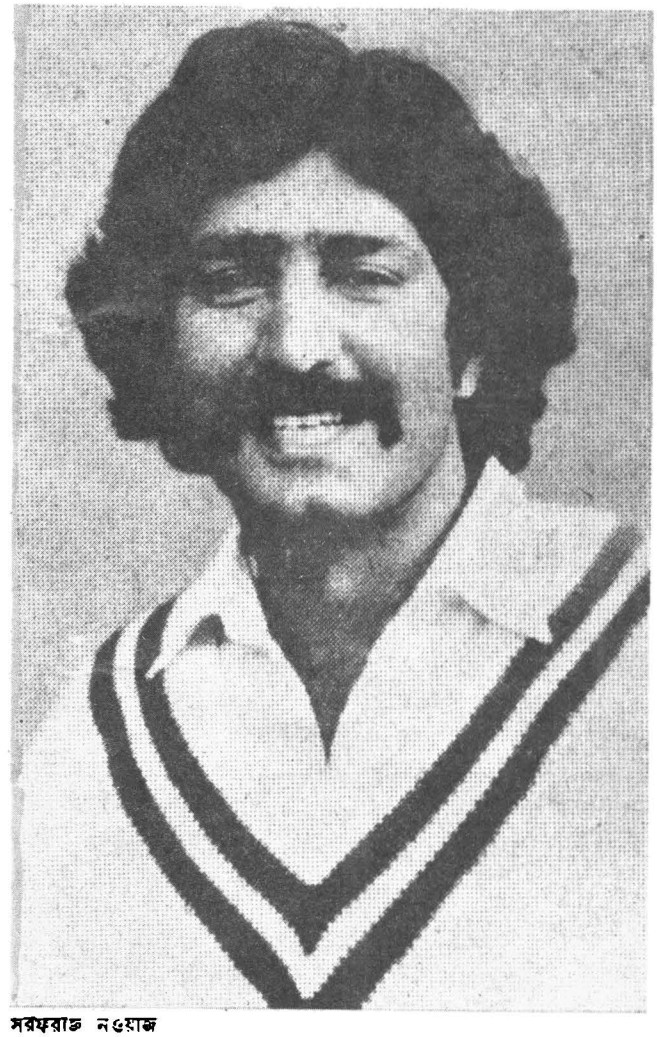

সরফরাজ নওয়াজ

ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটের কর্তৃপক্ষ মহলেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। দুই দলের অধিনায়কও ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করে ভবিষ্যতে যাতে এ-জাতীয় ঘটনা আর না ঘটে, সে-বিষয়ে সতর্ক হবার সিদ্ধান্ত নেন। অধিনায়ক ব্রিয়ারলি এবং বোলার উইলিস বলেছিলেন, "যে ব্যাটসম্যান এক ঘণ্টা দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেন, তাঁকে নিশ্চয়ই এলেবেলে ব্যাটসম্যান বলা যায় না।"

লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টটিকে বথহামের টেস্ট বলা যায়। সমারসেট কাউন্টির ২২ বছর বয়সী তরুণ বথহাম ব্যাট ও বল,

দুয়েতেই অসাধারণ সাফল্য দেখান। একদিকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং ক্রিকেটের উন্নত ছলাকলায় ভরা ১০৮ রানের উজ্জ্বল ইনিংস। অন্যদিকে বোলিংয়ে স্মরণীয় সাফল্য। প্রথম ইনিংসে তিনি পান চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও মারাত্মক হয়ে ওঠেন বথহাম। পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের উইকেটে তাঁর বলগুলি যেন নানাভাবে বিষাক্ত ছোবল মারতে চেষ্টা করে। মাত্র ১১ রানে ৭ উইকেট। একাই একশো। দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ পর্যন্ত বথহামের বোলিংয়ের গড় হিসাব দাঁড়ায় ২০.৫ ওভার, ৬ মেডেন, ৩৪ রান, ৮ উইকেট।

অথচ, পাকিস্তান প্রথম টেস্টে হারের পাল্টা জবাব দেবে দ্বিতীয় টেস্টের শুরুতে এমন আশার সৃষ্টি করেছিল। ইংল্যান্ডের দুই উইকেট পড়ে যায় ১৯ রানে। চা-বিরতিতে ৫ উইকেটে ১৮৭। ইংল্যান্ডের বড় ইনিংসেব আশা অনেকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য বথহাম (১০৮), রূপ (৬৯) এবং দলের দুই কমবয়সী খেলোয়াড় গোয়ার (৫৬) ও গুচের (৫৪) দক্ষতায় ইংল্যান্ড ৩৬৪ রানের বড় ইনিংস গড়ে তোলে।

উইলিস (৫ উইকেট) ও বথহামের (৪ উইকেট) ধারালো আক্রমণের মুখে পাকিস্তানেব প্রথম ইনিংস ভেঙে পড়ে ১০৫ রানে। ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান ১৩৯ রানের বেশি তুলতে পারে না বথহামের অসাধারণ বোলিংয়ের জন্য। এক ইনিংস ও ১২০ রানে জয়ী হয় ইংল্যান্ড। তিন টেস্টের সিরিজে পরপর দুটি টেস্ট ইনিংসে জিতে রাবার জিতে নেয়।

তৃতীয় টেস্ট বৃষ্টি-বিঘ্নিত। পাঁচ দিনের মধ্যে খেলার দুই-তৃতীয়াংশে অর্থাৎ প্রায় ২০ ঘণ্টা ছিচকাঁদুনে বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি। হেডিংলে মাঠে ৪২ বছরের টেস্ট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম দুটি দলের প্রথম ইনিংস শেষ হল না। পাকিস্তানের ২০১ রানের উত্তরে ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে ১১৮ রান তোলার পর খেলা পরিত্যক্ত হয়। ফলে তৃতীয় টেস্ট ড্র।

অবশ্য তৃতীয় টেস্টে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রাই বেশি নৈপুণ্য দেখান। সাদিক মহম্মদের ৯৭ রান এবং বোলিংয়ে সরফরাজ নাওয়াজের ৩৯ রানে ৫ উইকেটের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য, সরফরাজ প্রথম টেস্টে কয়েক ওভার বল করে আহত হন ও দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেন না। সরফরাজ আক্রমণের প্রধান ভূমিকা নিতে পারলে হয়তো পাকিস্তানকে প্রথম দুটি টেস্টে এমন শোচনীয় ভাবে হারতে হত না।

অন্যদিকে ইংল্যান্ডের চৌকস খেলোয়াড় বথহামের সাফল্যই সর্বাধিক। দুটি সেঞ্চুরি এবং ১৩টি উইকেট নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিরিজের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন বথহাম। ১৯৫৪ সাল থেকে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের টেস্ট খেলা শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৩টি টেস্টের মধ্যে ইংল্যান্ডের জয় ১১, পাকিস্তানের জয় ১, ড্র ২১।

বর্গ ও নাভ্রাতিলোভা

চিরঞ্জীব

গতবার উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার শতবর্ষে ইংল্যান্ডের একত্রিশ বছর বয়সী ভার্জিনিয়া ওয়েড মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বদেশের এতবড় একটি প্রতিযোগিতার মর্যাদা রেখেছিলেন বিশেষজ্ঞদের ফেভারিট না হয়েও। এবারও প্রায় তাই ঘটল মেয়েদের সিঙ্গলসে। একুশ বছর বয়সী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা প্রায় অঘটনই ঘটালেন। এবারের শীর্ষ বাছাই, উইম্বলডন এবং ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টিন এভার্ট ফাইনালে এমনভাবে (২-৬, ৬-৪, ৭-৫) হারবেন তা অনেকেই ভাবতে পারেননি। তবে নাভ্রাতিলোভা সম্ভবত দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন নিজের সম্পর্কে। উইম্বলডন প্রতিযোগিতার দু সপ্তাহ আগে ইস্টবোর্নের একটি প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে হারেন ক্রিস্টিন এভার্ট। চেকোস্লোভাকিয়ার এই মেয়েটির (জন্ম ১৮ অক্টোবর, ১৯৫৬) আশঙ্কাও কম ছিল না। এভার্টের মুখোমুখি হয়েছেন এর আগে ২৪ বার, এবং তার মধ্যে ২০টি খেলার ফল গিয়েছিল এভার্টেরই অনুকূলে। তবে ওই দুই মাস আগের এভার্টের ফল এবং সেমিফাইনালে আর-এক উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ইভন গুলাগংকে ২—৬, ৬—৪ ও ৬—৪ এ হারাবার পর নাভ্রাতিলোভা ধরেই নিয়েছিলেন, উইম্বলডন কোর্টও তাঁর দিকে। তাছাড়া ১৯৭৮ সালটা তাঁর কাছে খুব পয়া। উইম্বলডনের আগে ৬২টি ম্যাচের ৫৯টিতে তিনি শুধু জেতেননি, ওয়ার্ল্ড টীম টেনিসে, সিঙ্গলস ধরে মেয়েদের মধ্যে তিনি পয়লা নম্বরে স্থান পেয়েছেন। ১৯৭৭-এর পেশাদার যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর স্থান দ্বিতীয়, প্রথম এভার্ট। ১৯৭৭-এ বোনাস ও চ্যালেঞ্জের টাকা বাদে তিনি আয় করেন ২০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এবার জুলাই পর্যন্ত আয় প্রায় ২৫ লক্ষ।

নাভ্রাতিলোভাকে নিয়ে গত ২৫ বছরে তিনজন চেকোস্লোভাকিয়ান উইম্বলডন জিতলেন। তবে ১৯৫৪য় পুরুষদের সিঙ্গলসে বিজয়ী জারোস্লাভ ড্রবনি দেশ ছেড়ে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। ঠিক যেমন তিন বছর আগে চলে এসেছেন নাভ্রাতিলোভা আমেরিকায়। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব চাইছেন। ১৯৭৩-এর পুরুষ চ্যাম্পিয়ন ইয়ন কোডেস অবশ্য চেকোস্লোভাকিয়াতেই আছেন।

মা, বাবা ও সব আত্মীয়পরিজনকে ছেড়ে এলেও খেলার ব্যাঘাত ঘটেনি। তবে দুঃখটা হয়েছে উইম্বলডন জয়ের পরেই। প্রথমত এমন একজনকে ফাইনালে হারালেন, যিনি নাভ্রাতিলোভার আশ্রয়দাত্রী। মাতৃভূমি ছেড়ে আসার পর আমেরিকায় সবার আগে ওঁকে আপন করে নেন ওই ক্রিস এভার্ট। তিনিই ওঁকে বিলি জিন কিং-এর কাছে কোচিং নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। নাভ্রাতিলোভা কোন টুর্নামেন্টে খেলবেন, সেই পরামর্শও আসত এভার্টের কাছ থেকেই। বাঁ-হাতি, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার নাভ্রাতিলোভার দ্বিতীয় দুঃখ, তাঁর মা-বাবা প্রাগের কাছে বার্নিসে তাঁদের বাড়িতে বসে টিভিতে মেয়ের উইম্বলডন খেতাব জয় দেখতে পেলেন না।

অথচ বাবাই ওঁকে হাতে ধরে খেলা শিখিয়েছিলেন সেই ছোট্ট বয়স থেকে। মার্টিনা 'টেনিস ম্যাগাজিন'-এর নির্বাচনে 'স্পেশ্যাল অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড র‍্যাংকিং'-এ এভার্ট ও ভার্জিনিয়া ওয়েডের পরে। ১৯৭৫-এ আমেরিকায় গিয়ে মোস্ট ইমপ্রুভড খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম স্থান পেলেও তিনি ভুলতে পারেন না ফেলে-আসা দিনগুলির কথা। ১৯৭২-এ ১৬ বছর বয়সে হয়েছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ায় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। দেশত্যাগের আগে পর্যন্ত কেউ তাঁর ওই খেতাব কেড়ে নিতে পারেনি। উইম্বলডন জিতে বেশ খুশি হলেও নাভ্রাতিলোভা গর্বিত নন। বলেছেন, 'এখনও আমি বিশ্বের সেরা নই. ফ্রেঞ্চ ও যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়নশিপে জিততে হবে।'

নাভ্রাতিলোভার মতই শপথ সুইডেনের বিয়র্ন বর্গেরও। কুড়ি বছরে প্রথম, একুশ বছরে দ্বিতীয় ও বাইশ বছরে তৃতীয়বার উইম্বলডনের পুরুষ সিঙ্গলস জিতে 'বর্গ দ্য গ্রেট'

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

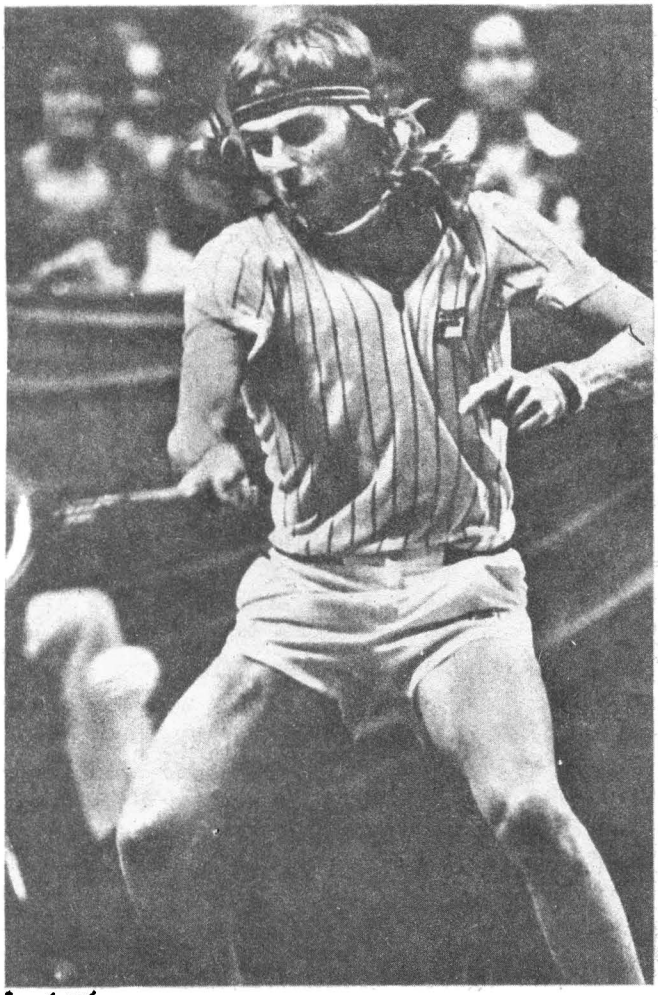

বিয়র্ন বর্গ

আখ্যা পেলেন। ১৯৭৬ ও ১৯৭৭-এ বর্গের জয়কে বলা হয়েছিল তারুণ্যের জয়। পর-পর তিনবার টেনিসের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন তো হলেনই, সেই সঙ্গে ধরে ফেললেন ৪১ বছর আগের একটি রেকর্ড। উইম্বলডনের ১০১ বছরের ইতিহাসে পর-পর তিনবারেরও বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কয়েকজন। যেমন ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হন ডবলিউ রেনশ। ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত আর এফ ডোহার্টি। ১৯০২ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত এইচ এল ডোহার্টি। ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত এ এফ উইল্ডিং। বিয়র্ন বর্গের আগে পর-পর তিনবার ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ব্রিটেনের এফ জে পেরি। ওই তিন বছরেই তিনি ফাইনালে হারান জি ভন ক্র্যাম-কে।

এবার ফাইনালে বর্গ যখন ৬—২, ৬—২ ও ৬—৩-এ হারালেন জিমি কোনর্সকে, ৬৯ বছর বয়সী প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ও বেতার ভাষ্যকার ফ্রেড পেরি তখন বেশ উঁচু গলায় বলে ওঠেন, 'ও আমার চেয়ে বড়, অনেক বড়। বর্গ প্রতিটি সেট জিতেছে লড়ে, কোনো রকম ফাঁকি ছিল না ওর খেলায়।'

'টু হ্যান্ডেড ব্যাক হ্যান্ড'-এর পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি উচ্চতার বর্গ সম্পর্কে ও'র কোচ লেনার্ট বার্গলিনের ধারণা, 'সে এবার যে ভাবে এগোচ্ছে, তাতে আরও সাফল্য আসবে। ইতিমধ্যে সে ফ্রেঞ্চ খেতাবটি জিতেছে। এস এস ওপেন ও অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পেলে গ্রান্ড স্লাম হবে।' বিশ্ব টেনিসে ওই সম্মানের অধিকারী মাত্র দুজন। ১৯৩৮-এ ডু বাজ, এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৯-এ রড লেভার। আত্মবিশ্বাসে ভরা বর্গ বলেছেন, 'আমি সকলের আশা পূরণের চেষ্টা করব।'

বর্গ যদি সফল হন, টেনিস রেকর্ডে তাঁর স্থান কোথায় হবে ? কেননা গতবারের রেকর্ডের খেলার পারফরমেন্সে তাঁর নাম পয়লা নম্বরে ছিল। তবে ১৯৭৭-এর এ টি পি কম্পিউটার তাং কিং-এ বর্গ ছিলেন দ্বিতীয়, প্রথম কোনরস। কোনরসের পয়েন্ট ছিল ৮৯৭, বর্গের ৮৫৮। কোলগেট গ্রাপ্রিতে পরপর ছিলেন গিলারমো ভিলাস ২০৪৭, ব্রায়ান গটফ্রিড ১৫৪৮, বর্গ ১২১০ পয়েন্ট। আয়ের দিক থেকে বর্গ ছিলেন অষ্টম। তাঁর আগে ছিলেন কোনরস, ভিলাস, নাস্তাসে, স্টকটন গটফ্রিড, ডিবস ও বেরুলাইটিস। বর্গ গত সাত মাসে ৪৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন বিভিন্ন টুর্নামেন্টে।

গ্র্যান্ড স্লামের সঙ্গে-সঙ্গে বর্গ হয়ত সব কিছুতেই প্রথম স্থানে চলে যাবেন। তাঁর মত এমন পাওয়ার-টেনিস নাকি আর কেউ খেলেন না। এমন নির্ভুল টপস্পিন ফোরহ্যান্ডও কারুর নেই।

খেলার মজা

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউড গ্রামে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছেন। শনিবার গেলেন খেলার মাঠে। গ্রামের দুটি দলে খেলা হচ্ছে। একটি দলে একজন খেলোয়াড় কম পড়ল। তাঁরা লারউডকে খেলতে অনুরোধ করলেন। অবশ্য তাঁরা জানতেন না যে, তিনি সেই দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার। লারউড ফিল্ডিং করতে লাগলেন। এদিকে আম্পায়ার কোনো খেলোয়াড়কেই আউট দিচ্ছেন না। অধিনায়ক লারউডকে বল করতে বললেন। তিনি কাছ থেকে দৌড়ে এসে অফ্ ব্রেক দিলেন। বলটি লাগল ব্যাটসম্যানের প্যাডে, একদম উইকেটের সামনে। আবেদন হল। আম্পায়ার বললেন, নট আউট। পরের বলটি দিলেন লেগব্রেক। ব্যাটের কোনায় লেগে স্লিপে ক্যাচ। তবু আম্পায়ার বললেন, নট আউট।

তখন লারউড রেগে গিয়ে টেস্টম্যাচে যেখান থেকে বল করেন, অর্থাৎ ২০ গজ দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করে ব্যাটসম্যানকে বোল্ড করে দিলেন। তিনটি স্টাম্পই ছিটকে গেল। লারউড আম্পায়ারের দিকে চেয়ে বললেন, "এবারেও কি নট আউট ?"

দিলীপ দত্ত

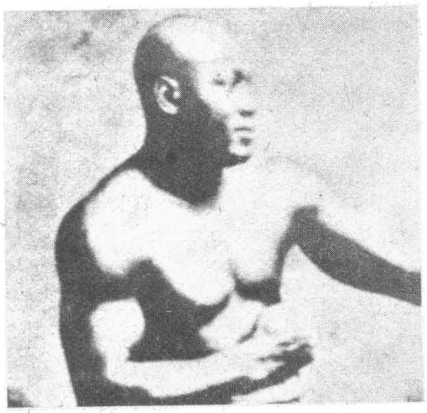

জ্যাক জনসন

সুব্রত সরকার

এই বছরই জ্যাক জনসনের জন্মশতবার্ষিকী। নামটা কি একটু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? বিশ্ব-ক্রীড়ার ইতিহাসে জনসনের স্থান কোথায়?

মহম্মদ আলি, লিয়ন স্পিঙ্কস, জর্জ ফোরম্যান, জো ফ্রেজিয়ার, সনি লিস্টন, ফ্লয়ড প্যাটারসন—অনেক বছর হল বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ নিগ্রো ফাইটারদের দখলে। শেষ সাদা চামড়ার চ্যাম্পিয়ন সেই সুইডেনের ইঙ্গেমনার জোহানসন, যিনি ১৯৫৯-৬০ সালে নয় মাসের জন্য খেতাব নিয়ে যান ইউরোপে। তবে "কালা আদমি"-দের এমন আধিপত্য তো চিরকাল ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত কোনো নিগ্রোকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লড়ার সুযোগই দেওয়া হয়নি। জ্যাক জনসনই প্রথম এই বাধা অতিক্রম করেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্সার হয়ে পরবর্তী কালের নিগ্রো হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নদের আগমনের সূচনা করেন।

জন আর্থার জনসন ১৮৭৮ সালে আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের গ্যালভেস্টন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় নিগ্রোদের আমেরিকায় নিম্ন জাতি বলে গণ্য করা হত। তারা বক্সিং করত শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে। কোনো নামকরা নিগ্রো বক্সার সাদা চামড়ার লড়িয়েদের হারিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হলে, বর্ণ-বৈষম্যের কথা তুলে নিগ্রো "চ্যাম্পিয়নের" সঙ্গে সাদা বক্সারকে লড়তে দেওয়া হত না।

তবে জ্যাক জনসন নিগ্রো বক্সারদের মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখালেন। সবাই বুঝতে পারল, এবার আর কালো-সাদার মুখোমুখি হওয়া আটকানো যাবে না। দশ বছর নিয়মিত লড়ার পরে, ১৯০৭ সালে, তখনকার হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন টম বার্নস দেখলেন, জনসনকে এড়ানো আর সম্ভব হচ্ছে না। জনসনের তখন ত্রিশ বছর বয়েস। বার্নস আমেরিকা থেকে চলে গেলেন ইংল্যান্ডে। কয়েক সপ্তাহ বাদে জনসনও সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে বার্নস তখন চলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার দিকে। তাঁর হিতৈষীরা তাঁকে বোঝালেন, এভাবে জনসনকে চিরকাল এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে এবার। সত্যিই তাই, কয়েক মাসের মধ্যেই জনসনও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে বার্নস অন্য দুটি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। সেই দুটি লড়াই জিতবার পরে ঠিক হল, বার্নস এবার জনসনের সঙ্গে লড়বেন।

১৯০৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর সিডনিতে অনুষ্ঠিত হল সেই ঐতিহাসিক লড়াই। লড়াইয়ের জন্য বানানো হল বিশেষ একটা রিং। বার্নস বিশেষ লম্বা ছিলেন না, আর জনসনের তুলনায় তাঁর ওজনও কম ছিল। সেদিন চোদ্দ রাউন্ড ধরে বার্নস জনসনের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করেছিলেন। তারপর তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ দেখে স্থানীয় পুলিশ লড়াই বন্ধ করে দেয়। জনসন হলেন পৃথিবীর প্রথম কালো হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। সঙ্গে সঙ্গে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খোঁজ পড়ে গেল এমন একজন সাদা বক্সারের, যিনি ওই খেতাব আবার ছিনিয়ে নিতে পারেন।

প্রথমে স্ট্যানলি কেচেল নামক এক বক্সারের সঙ্গে লড়াইয়ে জনসন এক ঘুষিতে পড়ে যান, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের এক আপারকাট মেরে কেচেলের চারটে দাঁত ফেলে দিয়ে নক-আউটে জেতেন। তারপর প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন জিম জেফ্রিসকে দাঁড় করানো হয় চ্যালেঞ্জার হিসাবে। অপরাজিত জেফ্রিস তখন একেবারেই লড়াই ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু, তাঁর উপর এমন চাপ সৃষ্টি করা হল যে, তাঁকে লড়াইয়ে নামতেই হল। ব্যবস্থা করা হল, লড়াইয়ের ফিল্ম তোলা হবে, সেই ফিল্ম দেখানো হবে দেশের লোককে। উদ্যোক্তারা আশা করেছিলেন, সাদা চ্যাম্পিয়ন জেফ্রিস কালো চ্যাম্পিয়ন জনসনকে হারিয়ে দেবেই। কিন্তু ১৫ রাউন্ড লড়াই চলার পরে দেখা গেল, জনসন টেকনিকাল নক-আউটে অনায়াসে জিতেছেন। লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে শুরু হল সাদা-কালো দাঙ্গা। লড়াইয়ের ফিল্ম দেখানো বেআইনি ঘোষিত হল।

এই ঘটনার বছর দুয়েক পরে জনসন আর-একজন সাদা চ্যালেঞ্জারকে হারালেন। সাদাদের কাছে অপ্রিয় জনসন তাঁর নিগ্রো স্ত্রীকে ডিভোর্স করে এক সাদা চামড়ার মেয়েকে বিয়ে করে দেশের ক্ষমতাশীল জাতির আরও অপ্রিয় হলেন। কিছুকাল পরে এই দ্বিতীয় স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। তখন জনসনকে আইনের ফাঁদে ফেলে এক বছর এক দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জনসন দেশ থেকে পালিয়ে যান ইউরোপে।

ইংল্যান্ডে তাঁকে লড়তে দেওয়া হয়নি, কিন্তু প্যারিসে তিনি কয়েকজনকে সহজেই হারিয়ে দেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে জ্যাক জনসন আবার ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে এক মার্কিন প্রযোজক জনসনকে মেকসিকোতে লড়াই করতে রাজি করান। জনসনকে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তিনি হেরে গেলে তাঁকে আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হবে, আর জেলও খাটতে হবে না।

জনসনের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম জেস উইলার্ড। তাঁর বয়স তখন ৩৪, জনসনের ৩৭। উইলার্ড তেমন বড় বক্সার না হলেও তাঁর চেহারা ছিল বিশাল। উচ্চতা, ৬ ফুট ৬½ ইঞ্চি! মেকসিকোর বদলে লড়াই হয় কিউবায়, হাভানা রেসকোর্সে। লড়াই হওয়ার কথা ছিল ৪৫ রাউন্ড। লড়াইয়ে জনসন ক্রমশই ক্লান্ত হতে থাকেন। ২৫ রাউন্ডে জনসনই পয়েন্টে ভালভাবে এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু পরের রাউন্ডে উইলার্ড জনসনকে নক-আউট করে দেন।

বড় লড়াইয়ে মাথা-কামানো ওই নিগ্রো চ্যাম্পিয়নের সেই হল প্রথম পরাজয়। তিনি অবশ্য পরে বলেছিলেন যে, তাঁকে পড়ে গিয়ে উঠতে মানা করা হয়েছিল। তবে, সে-কথা সম্ভবত সত্যি নয়। দেশে ফিরলে জনসনের সেই এক বছর হাজতবাস হয়।

আবার শুরু হল বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে সাদা বক্সারদের রাজত্ব। প্রায় পঁচিশ বছর পরে কালো বক্সার চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁর নাম জো লুই।

১৯৪৬ সালে জ্যাক জনসন এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। লুই তখন চ্যাম্পিয়ন। মৃত্যুর পরে জনসনের প্রশংসায় সাদারা পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। সত্যিই, অত সুন্দর লড়াইয়ের কায়দা খুব কম মুষ্টিযোদ্ধারই ছিল।

কালো বক্সারদের যিনি প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান আর স্বীকৃতি এনে দেন, সেই জ্যাক জনসনের কথা এ-বছর বার বার মনে পড়ে যায়।

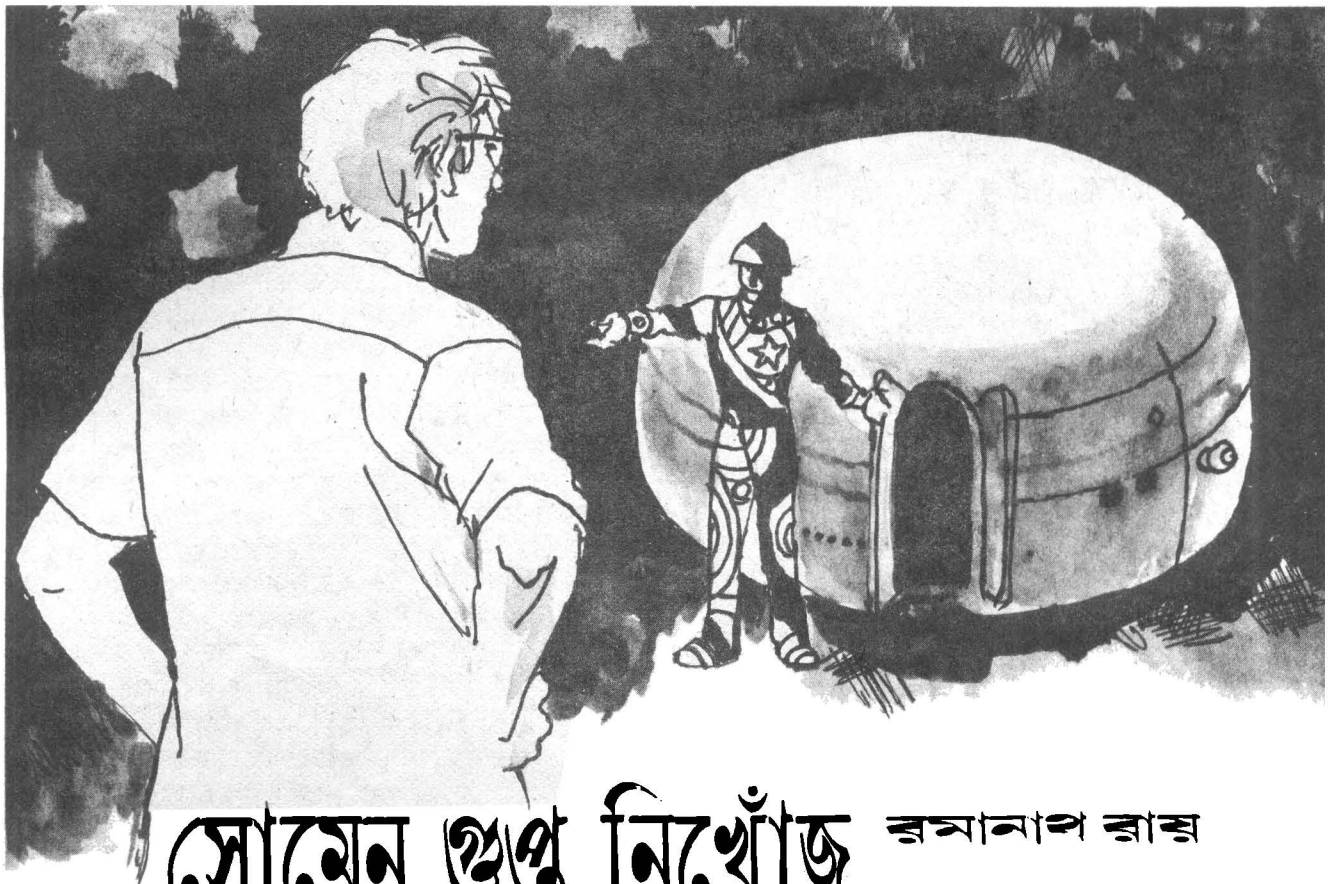

সোমেন গুপ্ত নিখোঁজ

রমানাথ রায়

মাঝপথে হঠাৎ প্লেন খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সবাই একে একে প্যারাসুট নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়লাম। দেখতে-দেখতে আমাদের প্যারাসুট ছাতার মত খুলে গেল। কিন্তু একজনের খুলল না। সে হুহু করে নীচে নেমে গেল। নীচে বঙ্গোপসাগর। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমরা নীচে নামতে লাগলাম। জোরে বাতাস দিচ্ছিল। বাতাসে আমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম। সরতে-সরতে কে কোন্‌দিকে গেল বুঝতে পারলাম না।

বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে আমি তীরে এসে নামলাম। সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। আমার শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। আমি কোমর থেকে প্যারাসুট খুলে শুয়ে পড়লাম। আমার চোখ ঘুমে বুজে এল।

ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে। সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার সঙ্গীদের কথা মনে পড়ল। তারা এখন কোথায় তা জানি না। তাদের খোঁজে আমি সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর যেতে-না-যেতে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি একটা লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা আমার সঙ্গীদের কেউ না। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। এই অচেনা জায়গায় এরকম অপরিচিত লোককে দেখে আমার একটু কৌতূহল হল। আমি আস্তে-আস্তে লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। লোকটা এতক্ষণ আমাকে দেখেনি। এবার আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আমাকে দেখেই হঠাৎ পিছন ফিরে দৌড়তে শুরু করল। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল? দৌড়োচ্ছেন কেন?"

লোকটা এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি হাঁটতে-হাঁটতে ফের তার সামনে এলাম।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "আপনি বাঙালী?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে কীভাবে এলেন?"

আমি তাকে সব খুলে বললাম।

লোকটা সব শুনে বলল, "যাক। নিশ্চিন্ত হলাম।"

সঙ্গে-সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কিসের চিন্তা ছিল?"

"গ্রেপ্তারের।"

আমি চমকে উঠলাম। "গ্রেপ্তারের! কারা গ্রেপ্তার করবে? কেন গ্রেপ্তার করবে?"

লোকটা একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "আপনি সোমেন গুপ্তর নাম শুনেছেন?"

"সোমেন গুপ্ত? হ্যাঁ, শুনেছি বই কী। তিনি তো একজন বিখ্যাত মহাকাশ-বিজ্ঞানী। তবে একবছর হল তিনি নিখোঁজ। শুনেছি—"

"কী শুনেছেন?"

"শুনেছি তিনি নাকি মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করতে-করতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।"

লোকটা একথা শুনে ভীষণ রেগে গেল। "চমৎকার! আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাকে পাগল বানানো হয়েছে।"

আমি এবারে রীতিমত বিস্মিত হলাম। "আপনিই সোমেন গুপ্ত?"

সোমেন গুপ্ত একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই সোমেন গুপ্ত।"

"তা, আপনি এখানে এলেন কী করে?"

সোমেন গুপ্ত তখন বলতে আরম্ভ করলেন ঃ

"সেদিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সারাদিন গবেষণার কাজ করতে-করতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিকেল হতেই ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কোথায় যাব? বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা বড় মাঠ। আমি হাঁটতে-হাঁটতে সেই মাঠের মধ্যে গিয়ে হাজির হলাম। আর তখনি একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়ল। দেখি মাঠের একধারে বিশাল রুপোর বাটির মত কী একটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দূর থেকে কিছু বুঝতে পারলাম না। তাই কৌতূহলী হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম তার ভিতরে একজন বসে আছে। তখন আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এটা অন্য কোন গ্রহের মহাকাশ-যান। এইসময় সেই ভিতরের লোকটা মহাকাশ-যানের দরজা খুলে দিয়ে ইশারায় আমাকে ডাকল। আমি ভিতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি এবার ভয় পেয়ে গেলাম। মহাকাশ-যানের ভিতর থেকে বাইরে আসার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু দরজাটা কিছুতেই খুলল না। তখন আর উপায় না দেখে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লোকটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। আমাকে একটা থাপ্পড় মেরে ঠাণ্ডা করে দিল। আমি তখন চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর মহাকাশ-যান মাটি ছেড়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। তার গতি বাড়তে লাগল। বাড়তে বাড়তে তার গতি এত তীব্র হয়ে উঠল তা আমাদের কল্পনার বাইরে। চারদিকে মহাশূন্যের গাঢ় অন্ধকার। সেই অনন্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মহাকাশ-যান ছুটতে লাগল। এই অন্ধকারের মধ্যে শুধু দূরে দূরে জ্বলজ্বল করছে সব গ্রহ-নক্ষত্র। এক সময় পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ প্রাণভরে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। পৃথিবী যে কত সুন্দর তা সেদিন প্রথম বুঝতে পারলাম। এই পৃথিবীও একটু পরে আমার চোখের বাইরে চলে গেল।"

এই পর্যন্ত বলে সোমেন গুপ্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নিশ্চয় ভাবছেন এসব মিথ্যে, বানানো?"

আমি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে উঠলাম, "না না, তা ভাবব কেন?"

সোমেন গুপ্ত একটু থেমে বললেন, "অবশ্য এসব শুনলে গালগল্প মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমিও যদি শুনতাম এসব তবে আমিও তা-ই ভাবতাম।"

প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে আমি বলে উঠলাম, "তারপর কী হল বলুন?"

সোমেন গুপ্ত আবার বলতে শুরু করলেন, "তারপর মহাকাশ-যান ছুটতে ছুটতে বহুদিন পরে এক অজানা গ্রহে এসে নামল। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা দুজনে মহাকাশ-যান থেকে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে কী হইচই চিৎকার চেঁচামেচি। কত ফোটোগ্রাফার যে আমাদের ফোটো তুলল তা বলতে পারব না। তবে একটা ব্যাপারে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি তাদের কথাবার্তার এক বর্ণ বুঝতে পারছিলাম না। অবশ্য এই অস্বস্তি বেশি দিন রইল না। আমি আস্তে আস্তে তাদের ভাষা শিখে নিলাম। তারাও আমাদের বাংলা ভাষা শিখে নিল। ক' মাস আমি বেশ আরামেই ছিলাম। তারা আমায় খুব খাতির করছিল। সেবা-যত্ন করছিল। কিন্তু একদিন তাদের আসল উদ্দেশ্য আমার কাছে ধরা পড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম তারা কেন আমাকে পৃথিবী থেকে এত দূরে টেনে এনেছে। আর কেনই বা তারা আমায় এত খাতির করছে, সেবা যত্ন করছে।"

এই বলে সোমেন গুপ্ত চুপ করে গেলেন।

আমি অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তাদের আসল উদ্দেশ্য কী?"

"তাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে লোহা, লুঠ করা।"

"কেন?"

"তাদের খনিজ সম্পদ শেষ হয়ে আসছে। লোহা তো প্রায় নেই বললেই চলে। তাই তারই সন্ধানে তারা পৃথিবীতে এসেছিল। কিন্তু কোথায় কী আছে তা তারা সঠিক জানে না। আমাকে নিয়ে গিয়ে তারা সব জেনে নিতে চেয়েছিল।"

"কীভাবে আপনি তাদের এই উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলেন?"

"যে লোকটা আমাকে ভাষা শেখাত, সে মাঝে-মাঝে আমাকে নানা প্রশ্ন করত। পৃথিবীর বিজ্ঞানচর্চা কতদূর এগিয়েছে তা কেবলি জানতে চাইত। বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে তার কৌতূহলের শেষ ছিল না। আমি প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি। তাই তার সব প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিতাম। কিন্তু এইসব প্রশ্ন করতে-করতে লোকটা শেষে পৃথিবীর খনিজ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। বিশেষ করে লোহা সম্পর্কে তার মারাত্মক আগ্রহ দেখলাম। তখনি আমার কেমন খটকা লাগল। মনে হল লোকটার আসল উদ্দেশ্য ভাষা শেখানো নয়, অন্য কিছু। আমি তা পরখ করার জন্যে একদিন বললাম, উত্তর মেরুতে প্রচুর লোহা পাওয়া যায়। সেখানে বিরাট-বিরাট খনি আছে। তারা ইচ্ছে করলে সেখান থেকে যত খুশি লোহা নিয়ে আসতে পারে। আমার এই কথা শুনে লোকটা ভীষণ রেগে গেল। তার চোখ মুখের চেহারা বদলে গেল। আমাকে ধাপ্পাবাজ, মিথ্যেবাদী বলে গালাগাল দিতে লাগল। সেই সঙ্গে বলল, উত্তর মেরুতে যে লোহা নেই তা তারা

বান

অনিল কর্মকার

নদীতে বাঁধ টইটুম্বুর
পাহাড়ে মেঘ থমথম,
হঠাৎ-হঠাৎ ঢেউ ছুটে যায়
বিষ্টি নামে ঝমঝম।
এই পাহাড়ে ওই পাহাড়ে
সবুজ-সবুজ ছল্‌ছল্‌,
গেট ছাপিয়ে বান ভেসে যায়
জল ছুটে যায় খলখল।
ঘুর-ঘুর-ঘুর টারবাইনের
দাঁতাল চাকা ছল্‌কায়,
রাত থইথই তারখুঁটিতে
বিজ্‌লি বাতি ঝলকায়।
চুপ চুপ চুপ, গ্রাম ডুবেছে
উঠল শহর গমগম,
সাঁঝ সকালে প্লেন ছুটেছে
দিল্লি থেকে দমদম।

অনেক আগেই জানে। সুতরাং এখানে মিথ্যে কথা বলে বিশেষ লাভ হবে না। বরঞ্চ বিপদ আছে। আমি এইসব শুনে একেবারে থ হয়ে গেলাম। লোকটা বলে কী! বুঝলাম, আমার ধারণাই ঠিক। ভাষা শেখানোর ভড়ং করে লোকটা আমার কাছ থেকে পৃথিবীতে লোহার খনিগুলো কোথায় তা জেনে নিতে চায়। শুধু তাই নয়, এই লোহার জন্যে তারা বহুবার পৃথিবীতে হানাও দিয়েছে। কিন্তু বিশেষ সফল হয়নি বলেই আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি সেই মুহূর্তে ঠিক করলাম, এখানে আর নয়। যে করেই হোক, এখান থেকে পালাতে হবে। পৃথিবীতে ফিরে এসে এই মারাত্মক ষড়যন্ত্রের কথা সকলকে জানিয়ে দিতে হবে। আমি তখন লোকটার কাছে ক্ষমা চেয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরের এই অঞ্চলটার কথা বললাম। লোকটা এবার চুপ করে রইল। কী যেন ভাবতে লাগল। বুঝলাম, এই অঞ্চল সম্পর্কে লোকটার কোন ধারণা নেই। লোকটা সেদিনকার মত চলে গেল। দুদিন পরে লোকটা জানাল, আমাকে মহাকাশ-যানে করে ঐ অঞ্চলে গিয়ে মাটি নিয়ে আসতে হবে। আমার সঙ্গে দুজন লোক থাকবে। যদি আমার কথা সত্যি হয়, অর্থাৎ মাটি পরীক্ষা করে যদি লোহার সন্ধান মেলে, তাহলে আমার কোন ভয় নেই। কিন্তু মাটি পরীক্ষা করে যদি লোহা না পাওয়া যায়, তাহলে আমার কঠিন শাস্তি। এর কদিন পরেই মহাকাশ-যানে আমার সঙ্গে আরো দুজনকে পুরে পৃথিবীর পথে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আবার সেই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা শুরু হল। বহুদিন ধরে এই অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে-ছুটতে একদিন পৃথিবীর কক্ষপথে এসে ঢুকলাম। তারপর আস্তে-আস্তে এই অঞ্চলে এসে নামলাম। মাটি তোলবার জন্যে আমি মহাকাশ-যানের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার দুজন সঙ্গী ভিতরেই বসে রইল। তারা আর বাইরে বেরুল না। আমি আগে থাকতেই তৈরি হয়ে ছিলাম। মাটিতে পা দিয়েই আমি মহাকাশ-যানের দরজায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। ঐ লোক দুটো আর বেরুতে পারল না। মহাকাশ-যানের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তবে আগুন লাগার সঙ্গে-সঙ্গে লোক দুটো এই দুর্ঘটনার কথা তাদের গ্রহে বেতারে জানিয়ে দিয়েছিল। আর সেই কারণেই আমি খুব ভয়ে আছি। ঐ গ্রহের লোকেরা এর প্রতিশোধ নেবেই। যে-কোন মুহূর্তেই তারা এখানে আসতে পারে। আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারে।"

এই বলেই সোমেন গুপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "ঐ দেখুন, ঝাঁকে-ঝাঁকে ওরা আসছে।"

আমি চমকে সেদিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, "ভয় নেই, ওগুলো হেলিকপটার। আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে নেমে আসছে।"

আমার কথা বোধহয় সোমেন গুপ্তর বিশ্বাস হল না। তিনি খুব চিন্তিত মুখে হেলিকপটারগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হেলিকপটারগুলো তীরের কাছে এসে চারদিকে ঘুরতে লাগল। আমি হাত তুলে ইশারা করতেই একটা হেলিকপটার আমাদের কাছে এসে নামল। সোমেন গুপ্ত তাতে উঠতে ইতস্তত করতে লাগলেন। শেষে অনেক বুঝিয়ে তাঁকে হেলিকপটারে ওঠালাম।

তারপর কলকাতা ফিরে সোমেন গুপ্তকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু মাসখানেক পরে সোমেন গুপ্তর বাড়িতে তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, তিনি আবার উধাও হয়েছেন। তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আবার চিন্তায় পড়ে গেলাম। তিনি কি সত্যিই তাহলে অজানা গ্রহের লোকদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন? আমি এর উত্তর জানি না। তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে আমি কিছু বলতে পারব না।

ছবি সুধীর মৈত্র

নাস্তা-নাবুদ

রঞ্জন ভাদুড়ী

নাস্তা নিয়ে ব্যস্ত বেজায়
পোস্তাবাসী খাস্তগীর--
খাস্তা গজা, পেস্তা-দেওয়া
জমাট-বাঁধা আস্ত ক্ষীর,
মস্ত বড় ডেকচিটাতে
গোস্ত আছে কবজিডুব,
পোস্তবড়া গণ্ডা-বিশেক,
ঝালঝোলেতে সবজি খুব!
বস্তাখানেক লুচির সাথে
সস্তা দরের শিককাবাব।—
রাস্তা দিয়ে যে যায়, বলে,
খাস্তগীরের শিক্ষাভাব,—
কুস্তিগীরও ত্রস্ত হবে
যে-সব খাবার দেখলে, সেই
হস্তিপ্রমাণ জাস্তি খানা
খাচ্ছে ব্যাটা—লজ্জা নেই!
আঁস্তাকুড়ে ফেললে ছুঁড়ে
এ-সব লোকের শাস্তি হয়—
সোয়াস্তি পায় দেশের মানুষ,
সবাই ভাবে—নাস্তি ভয়!

ছবি অনুপ রায়

দক্ষিণ-মেরু অভিযান

ক্যাপ্টেন স্কট

বিশাল কুমেরু বা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ পুরোপুরি বরফে ঢাকা। প্রথমে দুঃসাহসী তিমি মাছ শিকারীরাই পাল-তোলা জাহাজে এই দেশের কাছাকাছি এসেছিল। তারপর ১৭৭৩ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রথমবার কুমেরুবৃত্ত অতিক্রম করেন ক্যাপ্টেন কুক্। কুকের পর বহু অভিযাত্রীই কুমেরুতে অভিযান চালিয়েছেন, কিন্তু কেউই দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে পৌঁছতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত দুটি অভিযাত্রী বাহিনী অল্প সময়ের ব্যবধানে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছিলেন। ব্রিটিশ পরিচালিত অভিযাত্রী বাহিনীটির দলপতি ছিলেন ক্যাপ্টেন স্কট এবং নরওয়ের অভিযাত্রী বাহিনীটির দলপতি ছিলেন আমুন্ডসেন্।

আমুন্ডসেন্ যে দক্ষিণমেরু জয় করার পরিকল্পনা করছেন, একথা ক্যাপ্টেন স্কটের জানাই ছিল না। আমুন্ডসেন উত্তরমেরু অভিযান নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যেই খবর পেলেন উত্তর মেরু জয় হয়ে গেছে তিনি তাড়াতাড়ি দক্ষিণ মেরুর দিকে মন দিলেন। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে শীতকাল কাটিয়ে ১৯১১ সালের ২০ অকটোবর সরাসরি দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করলেন। আমুন্ডসেন তাঁর অভিযানে প্রচুর কুকুর সঙ্গে নিয়েছিলেন। এই কুকুরের দলই স্লেজে করে তাঁদের মালপত্র টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মাল বহনের কাজ শেষ হলে চল্লিশটি কুকুরকে রাস্তায় মেরে ফেলে তাদের মাংস খাওয়া হয়েছিল। বিপদে-ভরা পথ পার হয়ে ১৯১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমুন্ডসেন দক্ষিণ মেরু জয় করে সেখানে নরওয়ের পতাকা পুঁতে এলেন।

ক্যাপ্টেন স্কটের ভাগ্য প্রথম থেকেই খারাপ ছিল। ১৯১১ সালের জুন মাসে তিনি লন্ডন ত্যাগ করলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল বোধহয় মাল বহন করার জন্যে ঘোড়া আনা। মেরুদেশের ঠান্ডা ঘোড়াদের সহ্য হল না, বেশির ভাগই মারা গেল। বাদবাকিদেরও মেরে ফেলা হল, তাদের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে। ১৯১২ সালের ৪ জানুয়ারি স্কটের অভিযান শুরু হল। ১৯১২ সালের ১৮ জানুয়ারি তাঁরা দক্ষিণমেরুতে পৌঁছে দেখলেন সেখানে নরওয়ের বিজয়কেতন উড়ছে। এই আচমকা আঘাতের জন্যে কেউ তৈরি ছিলেন না। ভাঙা মন নিয়ে অভিযাত্রীরা ফিরে চললেন। তখন গরমকাল, কিন্তু তুষার-ঝড়ের বিরাম ছিল না, তার ওপর মালপত্র টানা, সঙ্গে খাবারও কম ছিল। পথে আঘাত পাওয়ার দরুন মৃত্যু হল একজন অভিযাত্রীর। একজন অভিযাত্রী তুষার-ক্ষতের জন্যে হাঁটতে পারছিলেন না। দলের অন্যদের বাঁচাবার জন্যে তিনি আত্মহত্যা করলেন। এদিকে ভীষণ তুষার-ঝড়ে নিশ্বাস নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। স্কটের তাঁবুতে আর মাত্র দুদিনের খাবার বাকি ছিল, কিন্তু ঝড় থামতে সাতদিন লেগে গেল এবং বাকি অভিযাত্রীদের হল তুষার-সমাধি। তাঁদের মৃত্যুর আট মাস পরে আরেকটি অভিযাত্রী দল স্কটের তাঁবু, স্কট ও তাঁর সঙ্গীদের মৃতদেহ, ডায়েরি, চিঠিপত্র সব খুঁজে পেয়েছিলেন।

আমুন্ডসেনই প্রথম দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে পৌঁছনোর গৌরব অর্জন করেছেন, কিন্তু আজও অধিকাংশ মানুষের সহানুভূতি হতভাগ্য ক্যাপ্টেন স্কটের দিকে।

দিদিমণি

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলি গত ১ জুলাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম-মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন স্মরণসভার আয়োজন করে। হাসপাতালের শিশু রোগীদের ফল, ফুল ও মিষ্টি উপহার দেওয়া হয়।

মণিমেলা মহাকেন্দ্র আয়োজিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ও ইংরেজি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পরিবর্তিত তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। প্রতিযোগিতা দক্ষিণ কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের বিপরীত দিকে তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে দুপুর ১টায় শুরু হবে। প্রতিযোগীদের বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে। নির্দিষ্ট ফর্মে নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রবেশ মূল্য প্রত্যেক বিষয়ে মাথা পিছু এক টাকা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগীদের জন্য বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়েই চারটি করে বিভাগ থাকছে। নির্বাচিত কবিতাগুলির অনুলিপি কেন্দ্র-কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বৃহস্পতি ও রবি ছাড়া সন্ধ্যা সাড়ে-ছটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে মণিমেলা মহাকেন্দ্র, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-২ ; রুম-৫ কলকাতা-৭০০০২৯ (ফোন : ৪৬-১৮১০) ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

মণি সন্দেশ

মধ্যমগ্রামের মহাভারতী মণিমেলা সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বীরভূমের আমেদপুরে জয়দুর্গা মণিমেলা নাচ-গান-আবৃত্তি-অভিনয়ে অংশ নেয়। কলকাতার ইণ্টালি মণিমেলা আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জগদ্দলের নবমিতালী মণিমেলা এক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। কলকাতার কসবা মণিমেলার ৩৮ তম বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। মধ্যমগ্রামের বিধান মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি বাদুতে সর্প উদ্যান দেখে এসেছে।

হাওড়ার সারস্বত মণিমেলা স্থানীয় এক ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। ২৪ পরগনার দক্ষিণ বারাসত মণিমেলা স্থানীয় দুটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। হাওড়ার হীরাপুর পল্লীমঙ্গল মণিমেলা আয়োজিত এক ফুটবল টুর্নামেণ্টে খেজুরি রত্নদীপ মণিমেলা বিজয়ী হয়েছে। বিরাটির পল্লী মণিমেলা আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেণ্টের ফাইনাল খেলা সম্প্রতি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ পরগনার নারায়ণ পল্লী মণিমেলা সম্প্রতি স্থানীয় এক ফুটবল টুর্নামেণ্টে রানার্সআপ হয়। গড়িয়ার কুঁড়ি ও কমল মণিমেলা স্থানীয় এক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

নমুনায় ভাল করে লক্ষ করো কেমনভাবে প্যাস্টেলের খড়ি উঠিয়েছি আর নামিয়েছি। ওঠানোর সময় লম্বাভাবে নিয়ে গেছি, কিন্তু টেনে নামাবার সময় সামান্য কাত করে নামিয়েছি বলেই পাতার চওড়া আকার পেয়েছি। আর গোল ফুলের বেলায় আড়াআড়িভাবে গোল করে ঘুরিয়েই পেয়েছি। প্রথমেই বলেছি, দরকার মনে হলে আগে ছক করে নিয়ে কাজ শুরু করতে পারো। নমুনার ফুল ছাড়া অনেক ফুল পাবে হাতের চাপ আর ঘোরানো-ফেরানোর মধ্যেই।

কারিগর

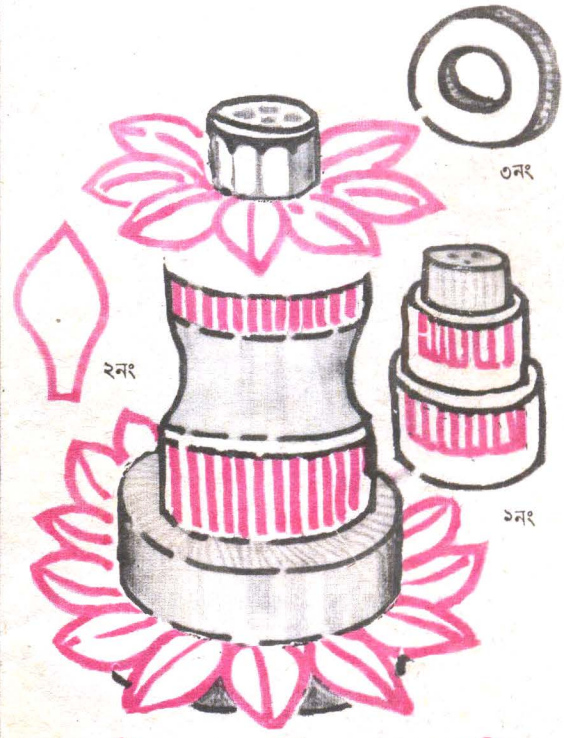

বাঁশের কাজ—ধূপদানি

জোগাড় করা জিনিস দিয়েই শুরু করো। নকশার মাপ অনুযায়ী এমনভাবে বড় থেকে ছোট তিন টুকরো বাঁশ কেটে নাও যাতে একটি টুকরো আর একটি টুকরোর মধ্যে চেপে বসে। মনে রেখো, মাথায় যে টুকরো বসবে, তার আর সবার নীচে যে টুকরো থাকবে তার একদিকের মুখ যেন বন্ধ থাকে। নীচের টুকরোর বন্ধ মুখ থাকবে জমির দিকে আর সবচেয়ে ওপরের টুকরোর বন্ধ মুখ থাকবে ঢাকনার মতো ওপর দিকে।

প্রথম বড় টুকরোর ভেতর দিকে ফেভিকলের আঠা লাগিয়ে দ্বিতীয় টুকরো বসিয়ে দাও। কিছু পরে তৃতীয় টুকরোর গায়ে আঠা লাগিয়ে দ্বিতীয় টুকরোর ওপরের গর্তে বসিয়ে শুকোতে দাও। (১নং ছবি) নমুনায় দেওয়া পাপড়ির জন্যে, কাগজে ফর্মা করে নিয়ে বাঁশের তৈরি পাতলা পাতির ওপর বসিয়ে (২নং ছবি) পাপড়ি কেটে নাও দরকার মতো। এবার ধূপদানির তলার পাপড়ি-গুলো ভাগ অনুযায়ী আঠা দিয়ে জুড়ে নিয়ে, শেষে বাঁশের গোল চাকৃতি (৩নং ছবি) লাগিয়ে মজবুত করো। একইভাবে ওপরের ছোট পাপড়িগুলো বসিয়ে নাও। সবশেষে ভারনিশ মাখিয়ে সুন্দর করে তোলো। বাহারের জন্যে বাজার থেকে রঙিন কাঠের চুড়ি কিনে ব্যবহার করতে পারো। নমুনার নকশা ছাড়াও অন্য ছক করতে পারো।

জেনে রাখো—(১) একটি টুকরো আর একটি টুকরোতে বসানোর সময় যেন ঢিলে না হয়। (২) সিরিশের কাগজ দিয়ে গা মাজলে বাঁশের নিজের চেকনাই নষ্ট হবে। (৩) ইচ্ছে হলে ওপরের আর নীচের পাপড়ির ছোট-বড় করতে পারো। (৪) ধূপের জন্য ফুটো নিজে না করে বাড়ির বড় কাউকে দিয়ে করাও। লম্বা সরু পেরেক আগুনে পুড়িয়ে বাঁশের মাথায় চাপ দিলেই ফুটো হবে। (৫) ধূপদানির মাথার গোলে খাঁজ কেটে নিলে বাহার বাড়বে। গরম পেরেক বেশিক্ষণ ধরে রাখলে ফুটো বড় হয়ে যেতে পারে।

আমাদের জন্মদিন
১৫ই আগস্ট

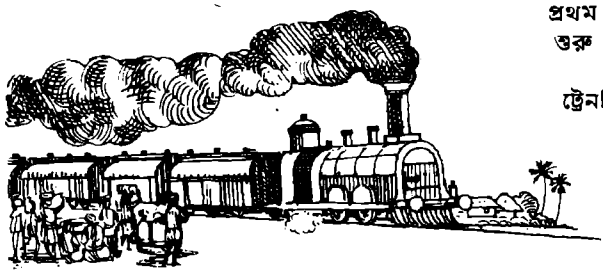

১৫ই আগস্ট ১৮৫৪, সকাল ৮-৩০ মিনিট। বহু প্রতীক্ষিত সেই লগ্ন সমাসন্ন। অগণিত দর্শকের প্রবল উচ্ছ্বাস ও হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রথম ট্রেনটি হাওড়া ছেড়ে ২৪ মাইল দূরবর্তী হুগলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। তিন হাজারেরও বেশি মানুষ এই প্রথম ট্রেনের যাত্রী হ'তে চেয়েছিলেন, মাত্র কয়েক'শ জনকে নেওয়া গেল। ট্রেনটিতে ছিল তিনটি প্রথম শ্রেণী ও দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, তিনটি খোলা ছাদের থার্ড ক্লাস আর গার্ডসাহেবের জন্যে একটি ব্রেক ভ্যান — সবকটি কিন্তু কলকাতাতেই তৈরী।

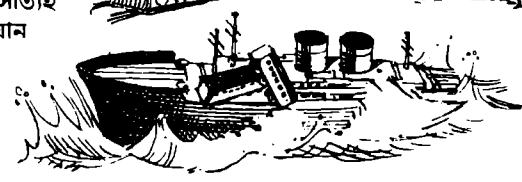

প্রথম শ্রেণীর ভাড়া তিনটাকা আর তৃতীয় শ্রেণীর ছিল সাত আনা। সারা যাত্রাপথ জুড়ে হাজার হাজার মানুষ ট্রেনটিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল সত্যিই বহু প্রতীক্ষিত। আমাদের পূর্বসূরী ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি বহু আগে কাজ শুরু করেও নানা দুর্বিপাক ও দুর্ঘটনার জন্যে এদেশে প্রথম ট্রেন চালানোর সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হননি। যেমন ধরুন যে জাহাজে করে রেলওয়ে কোচ আসছিল সেটি চড়ায় ডুবে গেল,

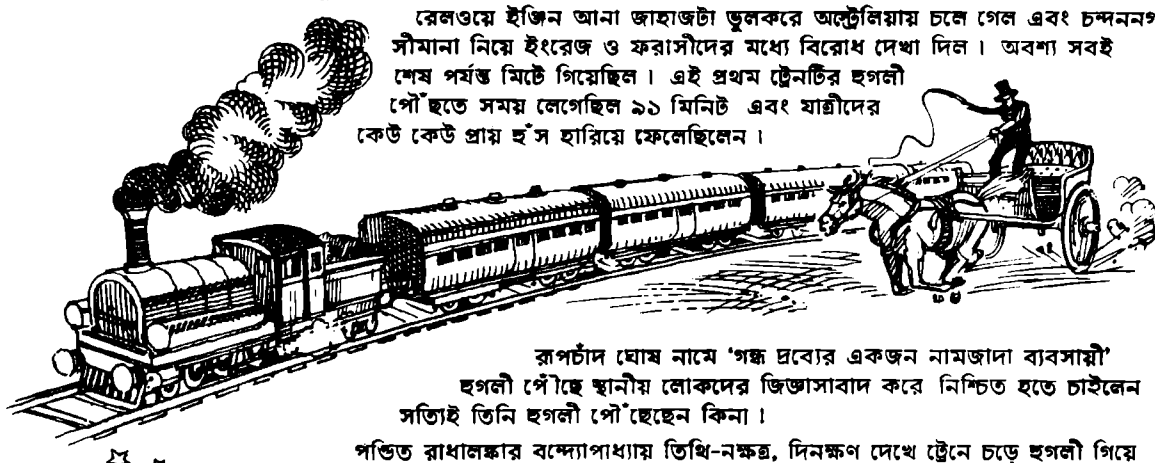

রেলওয়ে ইঞ্জিন আনা জাহাজটা ভুলকরে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল এবং চন্দননগরের সীমানা নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। অবশ্য সবই শেষ পর্যন্ত মিটে গিয়েছিল। এই প্রথম ট্রেনটির হুগলী পৌঁছতে সময় লেগেছিল ৯১ মিনিট এবং যাত্রীদের কেউ কেউ প্রায় হুঁস হারিয়ে ফেলেছিলেন।

রূপচাঁদ ঘোষ নামে 'গন্ধ দ্রব্যের একজন নামজাদা ব্যবসায়ী' হুগলী পৌঁছে স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হতে চাইলেন সত্যিই তিনি হুগলী পৌঁছেছেন কিনা!

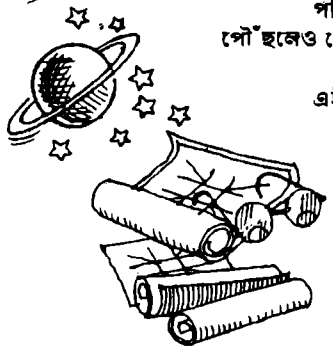

পণ্ডিত রাধালঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় তিথি-নক্ষত্র, দিনক্ষণ দেখে ট্রেনে চড়ে হুগলী গিয়ে পৌঁছলেও সেই 'আওগে গাড়িতে' করে আর তিনি ফিরতে রাজী হলেন না, কারণ তাঁর ধারণা হল এত দ্রুতগতির দরুন তাঁর পরমায়ু কমে যেতে পারে। জোনস্ নামে এক ভদ্রলোক এই প্রথম ট্রেনে চড়ার স্বাদ পেয়ে গতির নেশায় প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়ে নিজের জুড়িগাড়ির ঘোড়াটিকে চাবকে মেরেই ফেললেন।

ছোট্ট সেই শুরু থেকে আজ আমরা ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত রেলপথে পরিণত হয়েছি, যদিও গোড়া থেকেই আমাদের পথ বিন্দুমাত্র কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এখন আমরা প্রতিদিন ১০৫৪টি যাত্রী ট্রেন চালাই আর ১৫ লক্ষ যাত্রী বহন করি। কতো সুলভে? বিশ্বাস না হয় একটি হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত মান্থলি টিকিট কিনে নিজেই পরীক্ষা করে দেখো। আজ আমরা ১৮৫৪ সালের ভাড়ার অর্ধেকও নিই না। খুবই অবাক হলে—তাই না?

প্রথম ট্রেন চালানোর সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যবশত অল্পের জন্যে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলেও অন্য কোন বিষয়েই আমরা কিন্তু পিছিয়ে নেই—একথা আমরা কিন্তু জোর দিয়েই বলতে পারি।

পূর্ব রেলওয়ে
দুই শতাব্দীর যোগসূত্র

TCP/ER 500A1/78

রাম শ্যাম আর সার্কাসের জোকার রাজন

খেতে ভাল দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স

৫ রকম ফলের স্বাদে
ভরপুর— রাস্‌বেরী, আনারস, লেবু,
কমলালেবু ও মুসম্বী।

everest/78/PP/184-bn